স্বামী বিবেকানন্দ

(জীবন চরিত)

দ্বিতীয় খণ্ড

"One crowded hour of glorious life
Is worth an age without a name."

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অনুমত্যনুসারে উক্ত আশ্রম হইতে প্রকাশিত
স্বামিজীর ইংরাজী জীবন চরিত অবলম্বনে

শ্রীপ্রমথনাথ বসু এম-এ, বি-এল

প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল।

[মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রকাশক
ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ
উদ্বোধন কার্য্যালয়
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার
কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৪১।২৪

নিবেদন

স্বামিজীর জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে তাঁহার আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারত ভ্রমণের সমগ্র বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের ন্যায় ইহাও পূজ্যপাদ স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক আনুপূর্ব্বিক পরিদৃষ্ট, সংশোধিত ও স্থানে স্থানে পুনর্লিখিত হইয়াছে। এই সৌম্যমূর্ত্তি নীরব কর্ম্মবীর তাঁহার বর্ত্তমান ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া এই গ্রন্থের জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহাতে আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী। বস্তুতঃ তাঁহার সহায়তা না পাইলে এই পুস্তকের ঘটনাবলীতে বিস্তর ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া যাইত।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, নিজের লাভের জন্য এই পুস্তক প্রনয়ণে ব্রতী হই নাই। যাহাতে বাঙ্গালাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্বামিজীর অনুপম চরিত্রের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতে পারেন ও তাঁহার পবিত্র জীবনের সম্যক্ ও যথাযথ পরিচয় লাভ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ, মনন ও আলোচনা দ্বারা স্ব স্ব জীবন উন্নত করিতে পারেন, ইহাই এই পুস্তক প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য আমি যথাসাধ্য অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। কিন্তু তথাপি ইহাতে যে সকল ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যদি তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে কিঞ্চিন্মাত্রও উপকৃত হন তবেই সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

সন ১৩২৬
২৮শে ভাদ্র।

গ্রন্থকার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

স্বামিজীর ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিষ্যবৃন্দের দ্বাদশ বৎসরব্যাপী পরিশ্রমের ফলে হিমালয়স্থ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে তাঁহার যে সুবৃহৎ ইংরাজী জীবন-চরিত চারিখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে এতদিন বঙ্গভাষায় তাহার কোন অনুবাদ না থাকায় ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠকগণের একটি বিশেষ অভাব ছিল। সেই অভাব দূরীকরণার্থ আমি বহু অর্থব্যয়ে উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষের নিকট হইতে বিশেষ বন্দোবস্তসূত্রে উক্ত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বত্ব লাভ করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে অন্য কোন ব্যক্তির উক্ত ইংরাজী পুস্তক বা তাহার কোন অংশ সঙ্কলন, অনুবাদ, প্রকাশ বা প্রচার করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং এখন হইতে অন্য কেহ আমার অনুমতি ব্যতীত ঐ পুস্তকের কোন অংশ অনুবাদ বা উহার ঘটনাবলী গ্রহণ করিয়া ঈদৃশ অন্য কোন পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিলে আইনানুসারে আমার ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হইবেন। ইতি।

সন ১৩২৬ }
১৮শে ভাদ্র। }

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

সূচীপত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

পরিব্রাজক বেশে

মঠ স্থাপিত হইল বটে কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীরা অধিক দিন একত্রে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ে নির্জ্জনবাসের ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠিতেছিল। বাস্তবিক হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের চিরন্তন অভ্যাস ও প্রথা তীর্থভ্রমণে বহির্গত হওয়া এবং তীর্থভ্রমণ সমাপ্ত হইলে নির্জ্জনে বসিয়া একাকী ঈশ্বরচিন্তায় আপনাকে নিযুক্ত করা। জাতীয় জীবনের এই যে একটা ধারা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহাকে উপেক্ষা বা উল্লঙ্ঘন করা বড় সহজ নহে। ইহা যেন এদেশের লোকের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মঠ স্থাপিত হইলেও মঠবাসী সন্ন্যাসীদের পর্য্যটনস্পৃহা দূর হইল না। গৃহীদের মত একস্থানে জীবন কাটাইবার সংকল্প লইয়া বেশ গোছাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ইঁহাদিগের দ্বারা হইয়া উঠিল না। তাই দেখিতে পাই যে পরমহংসদেবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণীর সহিত প্রায় বৎসরাবধি বৃন্দাবনধামে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। যোগানন্দ, লাটু প্রভৃতি এই দলের। মঠ স্থাপনের কয়েক মাস পরে সারদা (স্বামী

ত্রিগুণাতীত) প্রথম মঠ হইতে নিরুদ্দেশ হন। সে সময়ে মঠাধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ছিলেন। তিনি আসিয়া যখন সারদার নিরুদ্দেশবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন তখন তাঁহার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, কারণ তিনি জানিতেন সারদা সংসারানভিজ্ঞ বালকবিশেষ, এই হঠকারিতার জন্য তাহাকে অনেক ভুগিতে হইবে। তিনি রাখালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'রাজা, তুই তাকে যেতে দিলি কেন? দেখ্‌দিকি কি মুস্কিলেই পড়া গেল। ছোঁড়াটা যে ভারি ভাবিয়ে তুল্লে! এ আবার বেশ এক মায়ার সংসারে বাঁধা পড়েছি দেখ্‌ছি।' কথাগুলি বাস্তবিক বড় সত্য। নরেন্দ্র গুরুভ্রাতাদিগের স্নেহজালে এতটা জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাহাদিগের বিন্দুমাত্র ক্লেশভোগ হইবে এ চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিতেন, তাঁহার মনে হইত তাহাদিগের ক্লেশভোগের জন্য প্রকৃত দায়ী তিনি, কারণ ঠাকুর যে তাঁহারই উপর তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক খানিক অনুসন্ধানের পর সারদার হস্তলিখিত একখণ্ড পত্র পাওয়া গেল, তাহাতে লেখা ছিল :—

"আমি হাঁটিয়া বৃন্দাবনে চলিলাম, এখানে থাকা আমার পক্ষে নিরাপদ নহে, কারণ মনের গতি বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে। আগে বাপ মা ও বাড়ীর সকলের স্বপন দেখ্‌তাম, তার পর মায়ার মূর্ত্তি দেখ্‌লাম। দুবার খুব কষ্ট পেয়েছি, বাড়ী ফিতে যেতে হয়েছিল, তাই এবার দূরে যাচ্ছি। পরমহংসদেব আমায় বলেছিলেন 'তোর বাড়ীর ওরা সব কোত্তে পারে ; ওদের বিশ্বাস করিস্‌নে।"

রাখাল মহারাজ বলিলেন 'দেখ্‌চো, এই সবের জন্য সে চ'লে গেছে।' কিঞ্চিৎ পরে তিনি পুনরায় বলিলেন 'আমি নিজেও মনে কচ্ছি একবার তীর্থভ্রমণে বেরুবো।' নরেন্দ্র তাহাকে ভৎর্সনা

করিয়া বলিলেন ‘হাঁ, তা যাবে বৈকি! ঐ রকম ভবঘুরের মত বেড়ালেই আর কি ভগবান সশরীরে দেখা দেবেন।’ মুখে এইরূপ বলিলেন বটে কিন্তু তাঁহার নিজের প্রাণটাও এখন হইতে পর্য্যটনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তবে পাছে সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে মঠটি ভাঙ্গিয়া যায় তাই অন্তরের ইচ্ছা অন্তরেই নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল ততই ঐ সংকল্পটা দৃঢ় হইয়া তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল। তিনি আর তাহা অপরের নিকট হইতে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কথায় বার্ত্তায় ভিতরের উচ্ছ্বাস ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। মহৎ ব্যক্তির হৃদয়ের বেগ অতিশয় প্রবল। একবার মনে উচ্চ সংকল্পের উদয় হইলে ক্রমে তাহার গতি এরূপ অপ্রতিহত হইয়া উঠে যে তাহার সম্মুখে জগৎ সংসার সব ভাসিয়া যায়। নরেন্দ্রেরও ঠিক তাহাই হইল। অন্তর্নিরুদ্ধ মনোভাব সময়ে সময়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণাবাত্যার ন্যায় সবলে বহির্গত হইয়া পড়িত। সে হৃদয়বেগ সন্দর্শনে গুরুভ্রাতারা শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। ক্রমে ক্রমে মঠের সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে তাঁহার প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহারা একে একে মঠ ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে মঠবাসীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িল। স্বামিজীও মাঝে মাঝে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। দুই চারি মাস ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার মঠে আসিতেন। কিয়দ্দিন থাকিয়া আবার পর্য্যটনে বাহির হইতেন। কিন্তু সকলে চলিয়া গেলেও শশী মহারাজকে কেহ মঠ ত্যাগ করাইতে পারিল না। তিনি একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় দুই চারি জনকে লইয়া ঠাকুরের দেহাবশেষ সাবধানে রক্ষা ও নিয়মমত তাঁহার নিত্য সেবা ও পূজাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে স্বামিজী নিজে বলিয়াছেন ‘আমি সকলের প্রাণে আগুন জ্বালিয়েছিলুম—

সকলকে মঠ ছাড়িয়ে ভিক্ষাবলম্বী সন্ন্যাসী করেছিলুম—পারিনি শুধু শশীকে। শশীকে জান্‌বি— মঠের মেরুদণ্ডস্বরূপ।'

বাস্তবিক ক্রমে মঠের সহিত একমাত্র শশী মহারাজেরই অতি নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিল। আর সকলের নিকট উহা একটা সাময়িক 'ডেরা'র মত হইয়া দাঁড়াইল। এদিক ওদিক ঘুরিয়া যখন শ্রান্তি বোধ হইত তখন দিন কতকের জন্য তাঁহারা মঠের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতেন।

প্রথম প্রথম স্বামিজী দিন কতকের জন্য অদৃশ্য হইতেন। আজ বৈদ্যনাথ কাল সিমুলতলা এই ভাবে এক একটা স্থানে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া আসিতেন, অবশ্য প্রত্যেক বারেই বলিয়া যাইতেন 'এই শেষ, আর ফির্‌ছি না,' কিন্তু প্রত্যেক বারেই কোন না কোন কারণে তাঁহাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মঠে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার একাকী ভ্রমণের সাধ পূর্ণ হইয়াছিল, এ সময়ে তিনি কোথায় থাকিতেন কেহ তাহার সন্ধান জানিত না বা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত না। পরমহংসদেবের তিরোভাবের পর চারিবৎসর কাল (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত) তিনি গুরুভ্রাতাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই অর্থাৎ হয় বরাহনগরের মঠে ছিলেন, না হয় গুরুভ্রাতাদের কাহাকেও না কাহাকেও সঙ্গে লইয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৯১ সালের প্রথম হইতে তিনি গুরুভ্রাতাদিগের সঙ্গ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিলেন। মহানগরী দিল্লীতে সেই যে বিচ্ছেদ হইল সেদিন হইতে আর কেহ তাঁহার ভ্রমণের সাথী হয় নাই। অবশ্য কোন কোন গুরুভ্রাতা ভ্রমণকালে তাঁহার সন্ধান করিতে ত্রুটী করেন নাই—কিন্তু তিনি প্রায়ই স্বীয় নাম

ও পরিচয়াদি পরিবর্ত্তন করিতেন, সুতরাং হঠাৎ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ ছিল না।

এইরূপ অবস্থায় দুই তিনবার মাত্র তাঁহার গুরুভ্রাতৃবর্গের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়, এবং ঐ কয়েকবারই তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষ তিরস্কার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন। স্বামিজীর প্রব্রজ্যাকালের ইতিহাস অতি কৌতূহলজনক। তিনি যতদূর সম্ভব, আপনার অতুল বিদ্যাবুদ্ধি গোপন করিয়া সাধারণ সাধুর ন্যায় ভ্রমণ করিতেন। এমন কি তিনি প্রকাশ না করিলে কেহ তাঁহাকে দেখিয়া বা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিত না যে তিনি এক অক্ষর ইংরাজী জানেন। অনেক সময় তিনি প্রতিজ্ঞা করিতেন, 'কাহারও নিকট ভিক্ষা চাহিব না ; যখন আপনি জুটিবে তখন খাইব।' ইহার ফলে সময় সময় তাঁহাকে একাদিক্রমে পাঁচদিবস পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে হইয়াছে, ইহা তাঁহার নিজমুখে ব্যক্ত। কতদিন পথিপার্শ্বস্থ ভগ্ন দেবালয়ে বা ধর্ম্মশালায় অথবা ঝোড় জঙ্গল ও পর্ব্বতগুহায় কাটিয়াছে। আবার এমন দিনও গিয়াছে যেদিন মাথা গুঁজিবার স্থান হয় নাই, উন্মুক্ত আকাশতলে বর্ষা ও শিশিরসম্পাতের মধ্যে অথবা প্রচণ্ড রৌদ্রে অগ্নিতপ্ত বালুকাভূমির উপর কাটিয়াছে। পরিধানে গৈরিকবাস ও গৈরিক আলখেল্লা, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু, সম্বলের মধ্যে একখানি গীতা। এই ভাবে রাজেন্দ্রগমনে সেই দীপ্ত-বিশালনয়ন, অনুপমকান্তি-বীরবপু-সন্ন্যাসী ভিক্ষান্ন সংগ্রহ ও তীর্থপর্য্যটনের জন্য 'নারায়ণ হরি' বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন।

* * * *

কয়েকটী কাছাকাছি স্থানে অল্পদিনের জন্য দুই চারিবার গমনাগমনের পর ১৮৮৮ সালে স্বামিজী স্থিরপর্য্যটন-সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া

সর্ব্বপ্রথম ৺কাশীধাম যাত্রা করিলেন। জীবনধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য কিছু সঙ্গে লইলেন না। কাশীধামে তিনি বিশ্বেশ্বর, বীরেশ্বর ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া একদিন সারনাথেও বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে সারনাথের স্তূপ ও মঠের ভগ্নাবশেষ অধিকাংশ বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। একদিন প্রাতঃকালে তিনি দুর্গাবাড়ীর মন্দিরাভিমুখে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একদল বানর তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। এই সকল বানর সময়ে সময়ে নিরীহ লোকের উপর নিতান্ত পাশবিক অত্যাচার করিয়া থাকে। স্বামিজী তাহা জানিতেন, সেইজন্য তাহাদিগের ঐরূপ ভাব দর্শনে দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন, তাহারাও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতি তাঁহার অনুসরণ করিল। তখন তিনি কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নভাবে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। উন্মত্ত বানরদলও তাঁহার পশ্চাতে দৌড়াইতে লাগিল। তাহারা প্রায় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে এমন সময় এক ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল 'থামো থামো; বানরদের সামনে দাঁড়াও।' সহসা এই বাক্য শ্রবণে স্বামিজীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ফিরিয়া আসিল। তিনি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া বানরদিগের সম্মুখীন হইলেন। অমনি ভীষণবেগে ধাবমান পশুসমূহ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল ও পরমুহূর্ত্তে ভীতভাবে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগের এবংবিধ ভাবপরিবর্ত্তন দর্শনে তিনি মনে মনে খুব হাসিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎ পরে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিলেন, তিনিও প্রত্যভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। স্বামিজী বুঝিলেন ইঁহারই উপদেশমত কার্য্য করাতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া তিনি আমেরিকায় একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন 'So face Nature. Face ignorance. Face Illusion. Never fly!' অর্থাৎ 'এইরূপে প্রকৃতি, অবিদ্যা ও মায়া সর্ব্বদা ইহাদিগের সম্মুখীন হইবে—কদাচ ইহাদের ভয়ে ভীত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিবে না।'

দ্বারকাদাসের আশ্রমে অবস্থানকালে ৺কাশীধামের অনেক পণ্ডিত ও সাধুব্যক্তির সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এইখানেই প্রসিদ্ধ মনস্বী ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত হিন্দুদিগের বিভিন্ন আদর্শের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁহার বহুক্ষণ আলাপ হয়। আলাপান্তে ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন "অদ্ভুত! এই বয়সে এতদূর জ্ঞান ও বহুদর্শিতা! ইনি কালে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি হইবেন সন্দেহ নাই।"

এই সময়েই তাঁহার ভাগ্যে ভারতবিশ্রুত ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দর্শনলাভ ঘটে। সকলেই জানেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী শেষ অবস্থায় কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। বিশেষ আবশ্যক হইলে কখন কখন ইঙ্গিতে মাটিতে লিখিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বহুবর্ষ পূর্ব্বে পরমহংসদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ আছে কিনা?' তাহাতে তিনি সঙ্কেতে বুঝাইয়াছিলেন যে যতদিন ভেদ বোধ আছে তত দিন পৃথক্, ভেদ বোধ রহিত হইলে দুইই এক। স্বামিজী ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এখান হইতে তিনি ভাস্করানন্দ স্বামীর নিকট গমন করিলেন। এই মহাপুরুষ পরমযোগী ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় আশ্রমে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থান করিতেন। স্বামিজী অতিশয় শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কথায় কথায়

কামকাঞ্চন ত্যাগের বিষয় উঠিল। ভাস্করানন্দ বলিলেন 'কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে কামকাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারে কি না সন্দেহ।' স্বামিজী বলিলেন 'কি বলেন মহাশয়! সন্ন্যাসধর্ম্মের মূল ভিত্তিই যে ওই!' তাহাতে ভাস্করানন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিয়াছিলেন 'তোম্ লেড়কা হো ক্যা জান্‌তা?' স্বামিজী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমি নিজে এরূপ লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছি।' ভাস্করানন্দ তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ায় উভয়ের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক হইয়াছিল।*

কাশী হইতে অযোধ্যা হইয়া তিনি আগ্রায় গমন করিলেন। পথে বরাবর ভিক্ষাই অবলম্বন ছিল। আগ্রার তাজ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিতেন 'ইহার অতি ক্ষুদ্র অংশ পর্য্যন্ত এক এক দিন ধরিয়া দেখিবার যোগ্য এবং সমগ্র সৌধটি যথার্থভাবে দেখিতে হইলে অন্ততঃ ছয় মাস সময়ের প্রয়োজন।' আগ্রার দুর্গদর্শনেও তাঁহার ইতিহাস-রহস্যজ্ঞ হৃদয়ে নানাবিধ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। আগ্রা হইতে তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে এক কপর্দ্দক নাই। পথ-পর্য্যটনে ক্লান্ত ধূলিধূসরিত দেহে তিনি বৃন্দাবনের সন্নিকটে পৌঁছিয়া

---

* ইহার কয়েক বর্ষ পরে স্বামী শুদ্ধানন্দ ও তাহারও কিঞ্চিৎ পরে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত ভাস্করানন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ স্বামীর শিষ্য ও গুরুভাই জানিতে পাইয়া বিশেষ সমাদর করিয়াছিলেন ও স্বামিজীর দর্শনলাভের জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখনও কিন্তু তিনি জানিতেন না যে এই বিবেকানন্দই সেই বালক, যাহার সহিত পূর্ব্বে একদিন তাঁহার এরূপ মতভেদ ও বচসা হইয়াছিল। শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণবশতঃ স্বামিজী আর তাঁহার সহিত দেখা করিবার সুযোগ পান নাই, তবে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

দেখিলেন এক ব্যক্তি মহা আরামে ধূমপান করিতেছে। ক্ষুৎপিপাসা-কাতর স্বামীজি তাহার নিকট হইতে কলিকাটি চাহিবামাত্র লোকটি নিতান্ত ত্রস্তভাবে বলিল 'মহারাজ, হাম ভঙ্গী (অর্থাৎ মেথর) হ্যায়।' স্বামীজি একথা শ্রবণে নিরাশচিত্তে চলিয়া গেলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইবামাত্র তাঁহার মনে হইল 'কি! সারাজীবন আত্মার অভেদ বিচার করিয়া শেষে জাতিভেদের পাকে পড়িলাম! ছি, ছি, এখনও সংস্কার!' এই ভাবিয়া তিনি প্রায় এক পোয়া পথ হাঁটিয়া পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া গেলেন। দেখিলেন লোকটা তখনও বসিয়া আছে। নিকটে গিয়া বলিলেন 'বেটা হামকো জলদী একঠো ছিলাম ভরকে দো।' সে পূর্ব্ববৎ বলিল, 'মহারাজ, আপ সাধু হ্যায়, ম্যয় ভঙ্গী হুঁ।' কিন্তু স্বামীজি তাহার কোন আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না। লোকটী অগত্যা সেই কলিকায় তামাকু সাজিয়া তাঁহাকে দিল। তিনি আনন্দের সহিত উহা সেবন করিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু স্বামীজির মুখে এই গল্প শুনিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন 'তুই গাঁজাখোর, তাই নেশার ঝোঁকে মেথরের কল্কে টেনেছিলি।' তদুত্তরে স্বামীজি বলিয়াছিলেন 'না জি, সি, সত্যই আমার নিজেকে পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। সন্ন্যাস নিলে পূর্ব্ব সংস্কার দূর হয়েছে কি না, জাতিবর্ণের পারে চলে গেছি কি না, পরীক্ষা করে দেখতে হয়। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসব্রত রক্ষা করা মহা কঠিন, কথায় ও কাজে এক চুল এদিক ওদিক হবার যো নেই।'

বৃন্দাবনে কয়েক দিন (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই হইতে ২০শে আগষ্ট) কাটিবার পর স্বামীজির মনে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ দেখিবার ইচ্ছা হইল, কারণ ব্রজভূমির সব স্থানই পবিত্র। গোবর্দ্ধনগিরি পরিক্রমকালে তিনি সংকল্প করিলেন কাহারও নিকট হইতে ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন

না। প্রথম দিবস মধ্যাহ্নে অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইল, তারপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, কিন্তু ক্ষুধায় ও পথপর্য্যটনে অবসন্নপ্রায় হইলেও তিনি কাহার নিকট ভিক্ষা চাহিলেন না। রাধারমণের মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে সহসা শুনিলেন কে যেন পশ্চাৎ হইতে আহ্বান করিতেছে, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ক্রমাগত সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই স্বর ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর হইল। তখন তিনি ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। সে লোকটিও ছুটিল এবং প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দৌড়াইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার সঙ্গে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী, সে স্বামীজিকে উহা গ্রহণ করিবার জন্য মিনতি প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বামীজি এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়ে পরিপ্লুত হইলেন এবং নারায়ণের অপার করুণা স্মরণ করিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিল।

গোবর্দ্ধন হইতে তিনি রাধাকুণ্ডে গমন করিলেন। এখানেও এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। একখানি মাত্র কৌপীন থাকাতে তিনি কৌপীনখানি প্রথমে কুণ্ডের জলে ধুইয়া উহার ধারে রাখিলেন ও পরে উলঙ্গ অবস্থায় স্নানের জন্য কুণ্ডমধ্যে অবতরণ করিলেন, স্নানান্তে দেখিলেন কৌপীনখানি আর সেস্থানে নাই, কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিলেন এক বানর কৌপীনখানি লইয়া একটি বৃক্ষের শাখায় বসিয়া আছে। তিনি বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া বানরটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে শুধু তাহার দন্তশ্রী প্রদর্শন করিল। কৌপীনটী ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাক, উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। স্বামীজি অনেক হাঙ্গামা করিয়া বানরের নিকট হইতে উহা ফিরাইয়া পাইলেন বটে, কিন্তু উহা তখন বানরের অত্যাচারে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায়

পরিণত। যাহা হউক স্বামীজি তখন কুণ্ডাধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি ঘোর অভিমানভরে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে এখন হইতে তিনি লোকালয়ে যাইবেন না, জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন তিনি বাস্তবিক ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন কি না। এই স্থির করিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতে কে যেন তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। স্বামীজি প্রথমে তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুত চলিতে লাগিলেন, সে ব্যক্তি স্বামীজির নাগাল পাইবার জন্য দৌড়িতে লাগিল, স্বামীজিও দৌড়িতে লাগিলেন, শেষে সে ব্যক্তি হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া নিজগৃহে লইয়া গিয়া সযত্নে খাওয়াইল ও নূতন বস্ত্র প্রদান করিল এবং তাঁহার গৃহে থাকিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল।

এই সকল ঘটনা হইতে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে তিনি প্রভুর অনুগ্রহ হইতে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত হয়েন নাই।

বৃন্দাবন হইতে বাহির হইয়া স্বামীজি উত্তরাখণ্ড হাতরাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হাতরাস ষ্টেশনের এক কোণে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, অনাহারে ও পরিশ্রমে দেহ মন অত্যন্ত ক্লান্ত—এমন সময় এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশনমাষ্টার শরৎ গুপ্ত কার্য্যোপলক্ষে সেই দিকে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। শরৎ গুপ্ত লোকটী বড় সুন্দর। ছেলেবেলা হইতে জৌন-পুরের মুসলমানদের মধ্যে বাস করিয়া বাঙ্গালা অপেক্ষা উর্দ্দূ ও হিন্দুস্থানী শীঘ্র বলিতে পারিতেন এবং চরিত্রটীও বেশ অকপট ও পুরুষোচিত গুণভূষিত ছিল। প্লাটফর্ম্মের উপর দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ

তাঁহার নজর পড়িল, একজন সন্ন্যাসী আসনপিঁড়ি হইয়া ষ্টেশন কম্পাউণ্ডের এক পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল 'বাঃ, এমন চমৎকার মূর্ত্তি সাধু ত কখন দেখিনি!' তিনি স্বামীজির দর্শনলাভে প্রকৃতই আনন্দলাভ করিলেন এবং ত্বরিতপদে তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন 'আপনাকে ক্ষুধিত বলিয়া বোধ হইতেছে।' স্বামীজি নাতি উচ্চকণ্ঠে উত্তর করিলেন 'হাঁ আমি ক্ষুধিতই বটে।'

"আচ্ছা আপনার জন্য কি আনিব?"

"যা হোক কিছু নিয়ে এস।"

অল্পক্ষণের মধ্যে শরৎ বাবু ষ্টেশনের কাঁথা কম্বল ঝাড়িয়া যাহা সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহাতেই স্বামীজির আহারের উদ্যোগ করিলেন।

স্বামীজি বহুদিন যাবৎ যৎসামান্য ভোজনেই তৃপ্ত ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি তাহারও অভাব হওয়াতে ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। এক্ষণে ভক্তপ্রদত্ত নানাবিধ আহার্য্য সামগ্রী পাইয়া পরিতোষসহকারে ভোজন করিলেন।

দৈনিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে শরৎ বাবু সাধুটিকে ভাল করিয়া দেখিবার ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বলিতেন স্বামীজির চক্ষুই তাঁহাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল এবং প্রথম দর্শনেই স্বামীজির উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তিনি স্বামীজিকে দিনকতক হাতরাসে থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং তারপর বলিলেন "আমায় কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিন।"

স্বামীজি উত্তরচ্ছলে একটি গান গাহিয়াছিলেন, সেটি মালিনী সুন্দরকে বলিয়াছিল—

"বিদ্যা যদি লভিতে চাও,
চাঁদ মুখে ছাই মাখ,
নইলে এই বেলা পথ দেখ।"

শ্রবণমাত্র শরৎ বাবু বলিলেন—"স্বামীজি, আপনি যাহাই বলিবেন তাহাই করিতে স্বীকৃত আছি। আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আপনার সহিত যাইতে প্রস্তুত।"

স্বামিজী তাঁহার নিস্পৃহ ভাব দর্শনে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন কিন্তু তখন কিছু বলিলেন না।

কথায় কথায় ব্রজেন বাবু বলিয়া একজনের নাম শুনিয়া তাঁহার মনে হইল—ইনি কলিকাতায় ছিলেন ও তাঁহার পরিচিত। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রজেন বাবুর বাসায় গমন করিলেন ও দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। ব্রজেন বাবু তাঁহার আগমনে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কয়েকদিবস নিজের বাসায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামিজী তাহাতে সম্মত হইলেন ও কয়েক দিন পরে পুনরায় শরৎবাবুর বাসায় ফিরিয়া যাইবার অঙ্গীকার করিলেন। ব্রজেন বাবুর বাসায় অবস্থানকালে ওখানকার বাঙ্গালীটোলার সমুদয় লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঠিক এই সময়টা বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশ একটা দলাদলি ও মনোমালিন্য চলিতেছিল, কিন্তু তাঁহার সংস্পর্শে সে সকল অন্তর্হিত হইল। তাঁহার মুখে ধর্ম্ম, দেশ ও জাতি সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী কথাবার্ত্তা শুনিয়া ব্রজেন বাবুর বাসায় উত্তরোত্তর অধিকতর লোকসমাগম হইতে লাগিল। স্বামিজী শরৎগুপ্ত ও নটুকৃষ্ণ বলিয়া শরৎবাবুর এক বন্ধুর বাটিতে প্রায়ই যাইতেন। ইঁহারা দুইজনে ক্রমশঃ তাঁহার বিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠিলেন ও নিজ নিজ বাসায় তাঁহাকে রাখিবার জন্য

অতিশয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আগ্রহ দর্শনে স্বামিজী অগত্যা কিছুদিন তাঁহাদের নিকট রহিলেন। সেখানেও অনেক গণ্য ও পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার কথাবার্ত্তা ও সঙ্গীত শ্রবণের জন্য যাইতেন।

একদিন প্রভাতে উঠিয়া স্বামিজী বলিলেন "আর আমি এখানে থাকিতে পারিতেছি না। সন্ন্যাসীর একস্থানে অধিকদিন থাকা উচিত নয়, আর এখানে থাক্‌তে থাক্‌তে ক্রমে তোমাদের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে পড়্‌ছি, এটা ভাল নয়।" সকলেই তাঁহাকে এ সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বলিল, কিন্তু তিনি বলিলেন "তোমরা আমায় পীড়াপীড়ি করিও না।" তাঁহার স্থিরসংকল্প দেখিয়া শরৎবাবু অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি স্বামিজীকে অতি নিকট আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে জৌনপুরের মুসলমান বন্ধুগণের নিকট সুফীদিগের ধর্ম্ম-সাহিত্য পাঠ করিয়াছিলেন। স্বামিজীকে দেখা অবধি তাঁহার মনে হইতেছিল ইনি যেন সুফীদিগের বর্ণিত প্রেমের জীবন্ত আদর্শ। এক্ষণে তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া তিনি বলিলেন "স্বামিজী আপনি আমায় আপনার শিষ্য করিয়া লউন।" স্বামিজী এ সময়ে শিষ্য গ্রহণের কল্পনাও করেন নাই এবং সহসা কোন শিষ্য গ্রহণ করা উচিত কি না সে সম্বন্ধেও তাঁহার কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল। সুতরাং শরৎ বাবুর প্রস্তাবে তিনি স্পষ্ট কোন জবাব না দিয়া বলিলেন "কি দরকার? আমার শিষ্য হইলেই যে অধ্যাত্ম জগতের সব জিনিষ তোমার করতলগত হইবে তাহা নহে। 'ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বিরাজমান' এইটি মনে রাখিও। তাহা হইলেই তোমার উন্নতি হইবে। মধ্যে মধ্যে তোমার সহিত দেখা হইবে।" কিন্তু শরৎ বাবু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন ও অবশেষে বলিলেন "স্বামিজী, আপনি

যাহা হয় অনুমতি করুন, আমি করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি আপনার সঙ্গে যেথায় ইচ্ছা যাইতে বলুন, আমি আপনার অনুগমন করিতে সম্মত আছি।" স্বামিজী তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া ঈষৎ কৌতূহলপূর্ণ-স্বরে বলিলেন "তুমি সত্যই আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত আছ?" শরৎ বাবু সম্মতিসূচক উত্তর প্রদান করিলে তিনি বলিলেন 'আচ্ছা, তা'হলে আমার ওই ভিক্ষাপাত্রটি গ্রহণ করিয়া ষ্টেশনের কুলীদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আন দেখি।' আদেশপ্রাপ্তিমাত্র শরৎ বাবু নিজ অধীনস্থ কুলিদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। স্বামিজী তদ্দর্শনে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই শরৎ বাবু কর্ম্মের ভার অপর একজনের উপর আপাততঃ দিয়া স্বামিজীর সহিত হৃষীকেশ যাত্রা করিলেন।

গৃহসুখে অভ্যস্ত সদানন্দ (স্বামিজী শরৎ বাবুকে পরে এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন) শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে সন্ন্যাসীর জীবন বড় কঠোর। সদানন্দ স্বামী এই সময়কার বৃত্তান্ত এইরূপ বলিতেন "এক দিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া আমার শরীর নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে দিন নিশ্চিত আমি মরিতাম। কিন্তু স্বামিজীর কি স্নেহ! তিনি আমায় ধরিয়া ধরিয়া কতকদূর লইয়া গিয়া সেদিন আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। আর একদিন একটি পার্ব্বত্য নদী পার হইয়া যাইতে হইবে। আমরা একজনের নিকট হইতে একটী ঘোড়া যোগাড় করিয়া নদী পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। নদীটি অতিশয় বেগবতী ও তলদেশ মসৃণ উপলাচ্ছাদিত। পদস্খলন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আর, একবার পদস্খলন হইলে মৃত্যু অবধারিত। আমি ঘোটকের উপর যাইতে লাগিলাম। স্বামিজী সহিসের ন্যায়

ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে দুই চারিবার এমন হইল যে ভাবিলাম বুঝি আর ঘোড়া রাখা যায় না। কিন্তু অসমসাহসী ও স্নেহার্দ্রহৃদয় স্বামিজী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও সেই ভাবে ঘোড়াশুদ্ধ আমাকে পার করিলেন। কেমন করিয়া তাঁহার প্রেম ও ভালবাসার বর্ণনা করিব? তিনি যেন প্রেমের অবতার ছিলেন। আর একবার আমার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছিল। তিনি আমার সমুদয় জিনিষপত্র এমন কি জুতাযোড়াটা পর্য্যন্ত বহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে থাকিলে মনে এতটা বল ও সাহস থাকিত যে মৃত্যুও তুচ্ছ বোধ হইত। একদিন পথে যাইতে যাইতে দেখা গেল একস্থানে কতকগুলি মনুষ্যের অস্থি ও তাহার আশে পাশে গেরুয়া কাপড়ের টুক্‌রা পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামিজী ঐ গুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন 'সদানন্দ, দেখ এখানে একজন সন্ন্যাসীকে বাঘে মারিয়াছে। ভয় হচ্ছে?' আমি উত্তর করিলাম "আপনি সঙ্গে থাকিলে কিসের ভয়?"

হৃষীকেশে স্বামিজী ও তাঁহার শিষ্য সাধারণ সাধুদিগের ন্যায় থাকিতেন। ভজন ভ্রমণ ও ধ্যান ধারণাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহাদের আরও উত্তরে কেদার বদরীর দিকে যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সদানন্দ স্বামী হঠাৎ কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ায় পুনরায় হাতরাসে ফিরিতে হইল। তাঁহাদের হাতরাস প্রত্যাগমনে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কিন্তু এখানে আসিয়া স্বামিজীও পীড়ার কবলে পতিত হইলেন। আহার বিহারের অনিয়মে উভয়েরই শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর হৃষীকেশের জল বায়ু তত ভাল নহে, কারণ ওখানে ম্যালেরিয়া আছে। সুতরাং উভয়েই ভুগিতে লাগিলেন। এই সময়ে কোন স্থানীয় বাঙ্গালী ভদ্র-

লোক সম্ভবতঃ বরাহনগর মঠে স্বামিজীর অসুস্থতার সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কারণ কয়েকদিন পরেই তিনি গুরুভ্রাতাদিগের নিকট হইতে বরাহনগরে ফিরিয়া যাইবার জন্য সানুনয় অনুরোধসহ একখণ্ড পত্র পাইলেন। সেই পত্রে আরও লিখিত ছিল যে, কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য তাঁহার একবার কলিকাতায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। এই পত্র পাইয়া তিনি দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও কলিকাতা যাত্রা করিলেন এবং সদানন্দ স্বামীকেও কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তাঁহার অনুগমন করিতে আজ্ঞা দিয়া গেলেন। স্বামিজী মঠে প্রত্যাগমন করিলে সকলেই অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। কয়েক মাস পরে সদানন্দ স্বামীও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বামীজীর পুনরাগমনের সহিত মঠে আবার পূর্ব্বভাব ফিরিয়া আসিল। ভ্রমণকালে তিনি যে সকল নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তৎসাহায্যে ভারতীয় সভ্যতার একত্ব তাঁহার সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি বলিতেন "রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে আপাত-বিচ্ছিন্ন ভারতখণ্ড আবার এক হইবে।" পূর্ব্ববৎ মঠের ভ্রাতাগণকে শিক্ষাদান আরম্ভ হইল। এই ভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে যখন তিনি বুঝিলেন যে উপস্থিত তাঁহার আর মঠে থাকিবার প্রয়োজন নাই, তখন তিনি পুনরায় দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

গাজীপুরের পাওহারী বাবা

এবার স্বামিজী সর্ব্বপ্রথমে গাজীপুরে উপস্থিত হইলেন। গাজীপুরের পাওহারী বাবা একজন অসাধারণ যোগী ও জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাপুরুষ-সন্ধানে ভারতের চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিতে করিতে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সন্ধান পান। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে সেই কথা শ্রবণাবধি স্বামিজী পাওহারী বাবার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর অনেকবার তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। গাজীপুরে তিনি রায় গগনচন্দ্র বাহাদুরের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে অনেক লোক প্রত্যহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে আসিতেন। তিনিও সকলকে যথাবিহিত উপদেশ প্রদান করিতেন। সংস্কার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন "পুরাতনের নিন্দা বা কঠোর সমালোচনা দ্বারা তাহার দোষ সংশোধন হইতে পারে না। সংশোধনের প্রণালী স্বতন্ত্র। অসীম প্রেম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। শিক্ষা দ্বারা ক্রমে সকলে আপনাপন অন্তরের মধ্যে বুঝিতে পারিবে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ। তারপর আপনা হইতেই মন্দটা ছাড়িয়া ভালটা গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে হিন্দুভাবে অণুপ্রাণিত হওয়া আবশ্যক। সকল বস্তু হিন্দুর চক্ষে, হিন্দুর দৃষ্টি লইয়া দেখা ও বুঝা উচিত। প্রকৃত শিক্ষা বাস্তবিক তাহাই, যদ্দ্বারা হিন্দুর আদর্শ আমাদের চক্ষে আরও মহান্ ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠে। কারণ এটা স্থির

জেনো যে হিন্দুধর্ম্ম একটা প্রকাণ্ড ভুল নয়। ডুবে দেখ, গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে অনুসন্ধান কর, তারপর বুঝ্‌তে পারবে কি অতলস্পর্শ সমুদ্র এই হিন্দুধর্ম্ম! বৈদেশিক শিক্ষার মোহে ভুলিও না। দেশটাকে বোঝো, জাত্‌টাকে বোঝো; জাতীয় জীবনের গতি, বৃদ্ধি ও প্রসার কোন্ দিকে, তার উদ্দেশ্য কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখী তাই দেখ। যখন নিজেদের ঠিক ঠিক বুঝতে পার্ব্বে তখনই সব গোল মিট্‌বে।"

গগনবাবু তাঁহাকে মিঃ রস্ (Mr. Ross) নামে একজন রাজপুরুষের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। রস্ সাহেব স্বামিজীকে হিন্দুপর্ব্বসমূহ বিশেষতঃ হোরি ও রামলীলার ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে গুটিকতক প্রশ্ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহাকে হিন্দুদিগের সামাজিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও কয়েকটি প্রশ্ন করেন। স্বামিজী এই সকল প্রশ্নের অতি সুন্দর সুন্দর উত্তর দিয়া সাহেবকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুধর্ম্মের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। শুনা যায় হোরির তত্ত্ব সম্বন্ধে উক্ত সাহেবের জন্য একটী প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন। রস্ সাহেব তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ পেনিংটনের নিকট তাঁহাকে লইয়া যান। পেনিংটন সাহেব তাঁহার নিকট অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। স্বামিজী জলস্রোতের ন্যায় অনর্গল বাক্যস্রোতে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্ম্ম ও যোগের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়, ভারতের আধুনিক পরিবর্ত্তনধারা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলি সবিশেষ যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজির কথাবার্ত্তায় এরূপ মুগ্ধ হন যে, তাঁহাকে বিলাতে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন ও সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবার প্রস্তাব করেন। কর্ণেল রিভেট কার্ণাক

(Rivett Carnac) নামক আর একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের সহিতও এই সময়ে বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘ আলোচনা চলিয়াছিল। কর্ণেল সাহেব তাঁহার অদ্ভুত বিদ্যা ও বিচারপ্রণালী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু বিশেষ আগ্রহসত্ত্বেও স্বামিজী এবার পাওহারী বাবার দর্শনলাভে সমর্থ হইলেন না। কারণ এই মহাপুরুষ এক উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত নির্জ্জন উদ্যানমধ্যস্থ গুহার অভ্যন্তরে বাস করিতেন। উহার মধ্যে সাধারণের প্রবেশের কোন উপায় ছিল না। তিনিও বহুদিন হইতে বাহিরে আসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে একদিনও লোকের সম্মুখে আসেন নাই। ভিতরেই থাকিতেন, কি করিতেন কেহ জানিত না। ইচ্ছা হইলে কখন কখন দ্বারের আড়াল হইতে কথা বলিতেন। স্বামিজী তাঁহার মাস মাস সমাধিস্থ থাকার কথা ও অন্যান্য আরও অনেক বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন কিন্তু তাঁহার দর্শন না পাইয়া ক্ষুণ্নমনে বরাহনগর ফিরিয়া গেলেন।

বরাহনগরে প্রত্যাগত হইয়া তিনি গুরুভ্রাতাগণের সহিত পাওহারী বাবার পবিত্র জীবনকাহিনী আলোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চিত্ত পাওহারী বাবার ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতুলনীয় মহত্ত্বও স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কারণ এই সময়েই * একদিন তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক একটি উক্তি গ্রহণ করিয়া তাহার উপর মোটা মোটা বহি লিখিতে পারা যায়। তাহাতে একজন গৃহী ভক্ত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "কেমন করিয়া, বুঝাইয়া দাও দেখি।" স্বামিজী তদুত্তরে বলেন 'তুমি তাঁর যে কোন উপদেশ বলো আমি বুঝাইয়া দিব।' তখন

* স্বামী সারদানন্দ বলেন, এই ঘটনাটী বহু পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল।

সেই ব্যক্তি ঠাকুরের মাহুত নারায়ণ ও হাতী নারায়ণের গল্পটির উল্লেখ করিলে স্বামিজী তিন দিন ধরিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে (১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর) স্বামিজী বৈদ্যনাথ ধামে গিয়া কয়েক দিন অবস্থান করিয়া কাশীধামে যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, স্বামী যোগানন্দ এলাহাবাদে সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। শুনিবামাত্র স্বামিজী এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন, এই স্থানে স্বামিজীর গুরুভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দ এবং পূর্ব্বোক্ত সদানন্দ প্রভৃতি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সকলের অহোরাত্র যত্ন ও সেবায় যোগানন্দস্বামী ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া স্বামিজী সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। এই সময়েই একদিন তিনি একজন মুসলমান ফকিরবেশী মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলেন। সে ব্যক্তির মুখের প্রত্যেক রেখাটী যেন বলিয়া দিতেছিল 'ইনি পরমহংস'। তাঁহাকে দেখিয়া স্বামিজী শঙ্করাচার্য্যের বিবেকচূড়ামণি হইতে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

"দিগম্বরো বাপি সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥"

যোগানন্দ স্বামী আরোগ্যলাভ করিলে স্বামিজী কিছুদিন ৺কাশীধামে থাকিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারির শেষভাগে গাজীপুরে গমন করেন।* এবার তিনি প্রথমে কিছুদিন তাঁহার বাল্যসখা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় ও পরে গগনবাবুর বাটীতে অবস্থান

* কেহ কেহ বলেন, স্বামিজী একবারমাত্র গাজীপুরে গিয়াছিলেন।

করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও পাওহারী বাবার দর্শনলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য। তদনুসারে তিনি বাবাজীর আশ্রমের অনতিদূরে এক নির্জ্জন লেবুবাগানে থাকিয়া ভিক্ষা ও লেবুর রস দ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন ও প্রত্যহ বাবাজীর দরজার নিকট গিয়া বসিয়া থাকিতেন। কয়েকদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে একদিন বাবাজীর দর্শন মিলিল। দর্শন অর্থে চাক্ষুষ দেখা নহে, দরজার পার্শ্ব হইতে আলাপ। পাওহারী বাবা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি।" স্বামিজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তিতিক্ষা ক্যায়সে বনে ?' পাওহারী বাবা বলেন, 'গুরুকা ঘরমে নৌকা মাফিক পড়া রহো।' পাওহারী বাবার সহিত আলাপ করিয়া স্বামিজী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন ইনি একজন হঠযোগী, কিন্তু এখন দেখিলেন শুধু হঠযোগী নহেন একজন অদ্ভুত রাজযোগীও বটে। তারপর আর একটি আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিলেন—পাওহারী বাবা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। তাঁহার গুহাতে পরমহংসদেবের একখানি ফটো ছিল তাহা দেখাইয়া তিনি স্বামিজীকে বলিয়াছিলেন 'ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার'। সুতরাং পাওহারী বাবার উপর স্বামিজীর অনুরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তে এক নূতন অভিলাষের উদয় হইল। তিনি স্থির করিলেন পাওহারী বাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। এরূপ ইচ্ছার দুটী কারণ অনুমিত হয়। প্রথমতঃ তাঁহার অন্তঃকরণে সত্যান্বেষণস্পৃহা চিরদিন বলবতী ছিল, কোন নূতন পথ বা আলোক দেখিতে পাইলে তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মন কিছুতেই নিরস্ত থাকিতে পারিত না। পাওহারী বাবাকে দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল ইনি যোগমার্গে বিচরণ করিয়া সত্যলাভে সিদ্ধকাম হইয়াছেন, সুতরাং ঐ মার্গের রহস্য অবগত

হইবার জন্য এবং তাঁহার মত দীর্ঘকাল একাসনে সমাধিস্থ হইয়া যাহাতে থাকিতে পারেন এই বিষয় শিক্ষার জন্য তাঁহার বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিল। দ্বিতীয়তঃ এ সময়ে তিনি কোমরের বাত ও অজীর্ণ রোগে বিলক্ষণ ভুগিতেছিলেন, তাঁহার ধারণা হইল হঠযোগের ক্রিয়া অভ্যাস করিলে ঐ দারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবেন। তারপর পাওহারী বাবার নিকট হইতে কোন বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিলে যে গুরুত্যাগ করা হয়, ইহা তিনি মানিতেন না। সুতরাং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি বাবাজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ নিশ্চয় করিলেন। বাবাজীও তাঁহাকে যথেষ্ট আশা ভরসা দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যেই সংকল্প স্থির হইল ও তিনি বাবাজীর গুহাভিমুখে যাইবার জন্য উঠিলেন অমনি কে যেন পিছন হইতে তাঁহাকে টানিয়া ধরিল। চরণদ্বয় আর চলিতে চাহিল না, সমস্ত শরীর ভার ও অবশ বোধ হইতে লাগিল এবং অন্তর কি যেন একটা সঙ্কোচ ও অভিমানের বেদনায় ভরিয়া উঠিল। তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন 'একি? এরূপ হইল কেন? বোধ হয় এবার ভীষণ পরীক্ষার সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইলাম।' কিন্তু তথাপি দীক্ষা গ্রহণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তাহা পূর্ব্ববৎ অটল রহিল এবং তাঁহার জন্য দিন স্থিরও হইয়া গেল। কিন্তু যেদিন দীক্ষা হইবে বলিয়া সব ঠিকঠাক তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। তিনি লেবুবাগানে একাকী এক খাটিয়ায় শয়ন করিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা কক্ষের অন্ধকার উদ্ভাসিত করিয়া পরমহংসদেবের মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে প্রকটিত হইল। সে মূর্ত্তি কি অদ্ভুত পবিত্র! নয়ন দুটি তাঁহার নয়নোপরি সংলগ্ন অথচ সে নয়নে কতই স্নেহ, কতই করুণা! স্বামিজী সেই বেদনাব্যঞ্জক ছল ছল চক্ষু দেখিয়া আর অস্থির

থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে অতিশয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। 'আমি কি অবিশ্বাসী! আমি কি কৃতঘ্ন!' এইরূপ আত্মগ্লানি তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু স্বামিজীর মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত ও ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল এবং অন্তরে কে যেন পাষাণের ভার চাপিয়া বসিল। অবশেষে তিনি কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন 'না, না, তা' কখনই হবে না। রামকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই এ হৃদয়ে স্থান পাবে না। প্রভু, দাস চিরদিন তোমারই চরণে বিক্রীত, আর কাহারও নিকট নয়! জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ।'

এই ঘটনার পর দীক্ষাগ্রহণের সঙ্কল্প দু' একদিন স্থগিত রহিল। কিন্তু ঐ মূর্ত্তির সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি ২।১ দিন পরে আবার পূর্ব্ববৎ সঙ্কল্প করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্ত্তিকে তাড়াইয়া দিয়া পাওহারী বাবার ধ্যান করিবেন এই স্থির সংকল্প করিয়া বসিলেন। কিন্তু আবার দীক্ষা দিবসের পূর্ব্বরাত্রের মত ঘটনা হইল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয় দিন এই মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে প্রকট হইয়াছিলেন। স্বামীজি দেখিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন তাঁহার সম্মুখে কাঁদ কাঁদ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। পাঁচ ছয় দিন এই ভাবে ঠাকুরের দর্শন লাভের পর দীক্ষা লইবার সঙ্কল্প তাঁহার মন হইতে এককালে তিরোহিত হইল।

পাওহারী বাবা এই ঘটনার পরেও তাঁহাকে দীক্ষা দিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার মন হইতে ঐ সঙ্কল্প একেবারে দূরীভূত হইয়াছে, শুধু যে উপরোক্ত দর্শনলাভের জন্য তাহা নহে, অন্য কারণও ছিল। তিনি দেখিলেন পাওহারী বাবা কোন কোন বিষয় আবার তাঁহার নিকটই শিখিতে চাহেন। ইহাতে তিনি বুঝিলেন বাবাজী এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, আর বুঝিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তুলনা নাই।

পুনর্যাত্রা

গাজীপুরে অবস্থানকালে স্বামিজী সংবাদ পান যে অভেদানন্দ স্বামী হৃষিকেশে পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহাকে হৃষিকেশ হইতে বারাণসীতে আনাইয়া স্বামিজী গাজীপুর পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত পূর্ব্বপরিচিত প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং অভেদানন্দ স্বামীর সেবা শুশ্রূষার সুবিধান করিয়া প্রেমানন্দ স্বামীর হস্তে তাঁহার ভারার্পণ করিলেন ও স্বয়ং প্রমদা বাবুর উদ্যানবাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই উদ্যানে তিনি অধিকাংশকাল তপস্যা ও সাধনভজনে যাপন করিতেন, কেবল মধ্যে মধ্যে এক আধ বার মন্দিরাদি দর্শনে বহির্গত হইতেন। ক্রমে অভেদানন্দ স্বামীর আরোগ্য-লাভের সম্ভাবনা ঘটিল। কিন্তু এই সময়ে আর একটি দুঃসংবাদ আসিয়া স্বামীজিকে অতিশয় কাতর করিয়া ফেলিল। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অন্যতম প্রধান গৃহী শিষ্য বলরাম বাবুর মৃত্যু সংবাদ। এই সংবাদ শ্রবণে স্বামিজী রোদন করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে প্রমদাবাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আপনি সন্ন্যাসী হইয়া এত শোকাকুল কেন? সন্ন্যাসীর পক্ষে শোক প্রকাশ করা অনুচিত।" স্বামিজী এই কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন "বলেন কি, সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া হৃদয়টা বিসর্জ্জন দিব? প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় অপেক্ষা বরং আরও অধিক কোমল হওয়া উচিত। হাজার হোক আমরা মানুষ ত বটে! আর তা ছাড়া, তিনি যে আমার গুরুভাই ছিলেন। আমরা এক গুরুর চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছি।

যে সন্ন্যাসে হৃদয় পাষাণ কর্ত্তে উপদেশ দেয় আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।" ইহার অব্যবহিত পরেই বলরাম বাবুর পরিবারবর্গকে দর্শন করিবার জন্য তিনি বারাণসী হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর সার্দ্ধ চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। স্বামীজির মন ভূয়োদর্শন দ্বারা উত্তরোত্তর বিকশিত হইতেছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর ভারতের জীবন গঠিত এবং আধ্যাত্মিক তেজের তারতম্যের উপরই ইহার উন্নতি ও অবনতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে।

দুই মাস কাল মঠে অবস্থান করার পর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্বামিজী আবার বহির্গত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও সংকল্প রহিল আর ফিরিবেন না এবং এবার তাঁহার এই সংকল্প প্রায় সফলও হইয়াছিল; কারণ এখন হইতে সাত বৎসরের মধ্যে তিনি আর মঠে ফিরিয়া আসেন নাই। ইতিমধ্যে মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে উঠিয়া গিয়াছিল এবং আরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু এবার স্বামিজীর উদ্দেশ্য ছিল হিমালয়খণ্ড পরিভ্রমণ করিবেন, কারণ ঠিক এই সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ তিব্বত হইতে ফিরিয়া লামাদিগের আবাস, কেদার বদরীর মহান্ গম্ভীর সৌন্দর্য্য ও কাশ্মীরের মনোরম দৃশ্যাবলীর একটী সুরঞ্জিত চিত্র মঠের সন্ন্যাসীদিগের সম্মুখে ধরিলেন। তাঁহার বর্ণনা শুনিয়া স্বামিজী উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, 'হাঁ তোর মতন লোকই আমি চাচ্ছি, চল্ দুজনে আবার বাহির হই।'

এবার স্বামিজী স্থির করিলেন যে আর পাওহারী বাবা বা অন্য কোন সাধুর নিকট যাইবেন না, কারণ তাহাতে নিজের লক্ষ্য হইতে বড় বিচলিত হইতে হয়। এবার সোজা হিমালয়ে গিয়া উঠিবেন।

মঠ ত্যাগকালে তিনি গুরুভাইদের বলিলেন “এবার আর স্পর্শমাত্র লোককে বদ্‌লে ফেল্‌তে পারার ক্ষমতালাভ না করে ফির্‌ছি না।” যাইবার পূর্ব্বে একদিন ঘুস্থুড়ীতে গিয়া শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণীর চরণ বন্দনা করিয়া আসিলেন, তারপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া অখণ্ডানন্দ স্বামীর সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন।

সর্ব্বপ্রথম তাঁহারা ভাগলপুরে আসিয়া কিয়দ্দিনের জন্য বিশ্রাম করিলেন। এখানে একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। তাঁহার সহিত পূর্ব্বে স্বামীজির আলাপ ছিল। প্রথম দিন মধ্যাহ্নে ভাগলপুরে পৌছিয়া তাঁহারা রাজা শিবসিংহের বাটীর সন্নিকটে গঙ্গা-তীরে অবস্থান করিলেন। তখন তাঁহারা সাধারণ সাধুদিগের ন্যায় ছিন্ন-মলিন-বস্ত্র-পরিহিত ও দণ্ডকমণ্ডলুধারী। কিন্তু তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সেখানকার লোকেরা সহজেই বুঝিল যে তাঁহারা নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর সাধু নহেন। মন্মথনাথ চৌধুরী নামে একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক এই সময়ে স্বামীজির বাগ্‌বৈভব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম মানিতে আরম্ভ করেন এবং এমন কি রাধাকৃষ্ণলীলা পর্য্যন্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। স্বামিজী ইঁহার ভবনে এক সপ্তাহকাল ছিলেন। এখান হইতে এক দিন তিনি বরারীর পবিত্রচেতা মহাত্মা পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়কে দেখিতে যান। আর এক দিন নাথনগরের জৈনদিগের মন্দির দেখিতে যান। মন্মথবাবু প্রথমে স্বামিজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু শেষে তাঁহার প্রভাবে এতদূর মুগ্ধ হন যে কিছুতেই আর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন না সঙ্কল্প করেন ও পরে একদিন তাঁহার স্থানান্তর গমনের সুযোগ পাইয়া স্বামিজী ভাগলপুর হইতে অদৃশ্য হইলে তাঁহার অন্বেষণে আলমোড়া পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছিলেন।

ভাগলপুর পরিত্যাগের প্রাক্কালে জৈন আচার্য্যদিগের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর অনেক আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মতত্ত্বে স্বামিজীর অধিকার দেখিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। স্বামিজীও তাঁহাদের সহিত আলোচনার ফলে জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে বেশ একটা সুযুক্তিপূর্ণ ধারণা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন—বুঝিলেন যে উহা হিন্দুধর্ম্মেরই একটা শাখা মাত্র এবং বৌদ্ধদর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

অতঃপর অখণ্ডানন্দ স্বামীর ইচ্ছানুসারে তাঁহারা বৈদ্যনাথধামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম প্রচারক শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হন। স্বামিজী ঐ সময়ে এমন ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতেন যে, যাহাতে লোকে তাঁহাদিগকে সাধারণ অশিক্ষিত সাধুমাত্র মনে করে, এই কারণে অখণ্ডানন্দকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহারা যে ইংরাজী জানেন একথা রাজনারায়ণবাবুকে জানিতে দেওয়া হইবে না। সুতরাং কথাবার্ত্তা বাঙ্গালাতেই হইল। কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত বচনবিন্যাস, বাগ্মিতা ও ভাবচ্ছটায় রাজনারায়ণবাবু চমৎকৃত হইলেন। স্বামিজী ও তাঁহার সহচর ভ্রমক্রমেও একটী ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করায় রাজনারায়ণবাবু বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহারা ইংরাজী জানেন। ইহাতে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজনারায়ণবাবু একবার হঠাৎ ‘plus’ কথাটা উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর যেই মনে হইল ইঁহারা ইংরাজী জানেন না অমনি তাড়াতাড়ি দুইটি অঙ্গুলি উপর্য্যুপরি চিহ্নের মত রাখিয়া মনোভাব প্রকাশ করিলেন।

রাজনারায়ণ বাবুর সহিত সাক্ষাতের পরদিন তাঁহারা ৺কাশীধাম

অভিমুখে গমন করিলেন। কাশীতে থাকিতে থাকিতে স্বামিজীর প্রাণ পূর্ণ-জ্ঞানলাভের জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে বলিয়াছিলেন "ইহার পর পুনরায় যখন এখানে আসিব তৎপূর্ব্বেই দেখিবেন একটা বোমার মতন লোকসমাজের উপর পড়িয়াছি।" কথাটা খুব খাটিয়া গিয়াছিল।

ইহার পর অখণ্ডানন্দ স্বামী স্বামিজীকে অযোধ্যানগরীতে পুণ্যশ্লোক মোহন্ত জানকীবর শরণের সহিত সাক্ষাতের জন্য লইয়া যান। স্বামিজী প্রথমে কিছুতেই রাজী হন নাই, বলিয়াছিলেন 'এখন আর নয়, এখন বরাবর হিমালয়ের দিকে চল।' কিন্তু অখণ্ডানন্দ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে তিনি উক্ত মোহান্তের আশ্রমে গমন করিলেন। মোহান্ত মহাশয় সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ও একজন প্রকৃত তত্বজ্ঞ সাধক ছিলেন। তিনি নবাগত অতিথিদ্বয়কে বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন, এবং অতি সরল অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষতঃ ভক্তি বিষয়ে নিজে যতদূর জানিতেন তাঁহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন এবং বলিতে বলিতে আত্মহারাপ্রায় হইয়া ভাবস্থ ও তন্ময় হইয়া গেলেন। স্বামিজী তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাতিশয় পুলকিত হইলেন। সেদিন তাঁহার আশ্রমে আহারাদি করিয়া পুনরায় হিমালয় অভিমুখে চলিলেন। আশ্রম হইতে প্রস্থানকালে স্বামিজী অখণ্ডানন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "তুই যে এখানে আমায় এনেছিলি এতে বড় খুসী হয়েছি; আজ প্রকৃতই একজন সাধু পুণ্যাত্মার দর্শনলাভ ঘটিল।"

হিমালয় ক্রোড়ে

ইহার পর আমরা ইঁহাদের দর্শন পাই নৈনিতালে বাবু রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের বাটীতে। পদব্রজে হিমালয়ের পাদদেশ অতিক্রম করিয়া ইঁহারা নৈনিতালে উপস্থিত হন ও রমাপ্রসন্নবাবুর বাটীতে ছয় দিবস যাপন করেন। তারপর এখান হইতে বদরিকাশ্রম দর্শন করিবার জন্য উভয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া বহির্গত হন। সঙ্গে একটী পয়সা নাই, কোথায় আহার বা শয়ন হইবে তাহারও স্থিরতা নাই, অথচ দুজনে চলিয়াছেন। তৃতীয় দিবস ভ্রমণের পর বহুক্ষণ অনাহারে অবস্থিতি হেতু পরিশ্রান্ত দেহভার লইয়া তাঁহারা এক বেগবতী তটিনী তটস্থিত প্রাচীন ও সুবিশাল অশ্বত্থবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী তাঁহার সহচরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'কি সুরম্য স্থান! ধ্যানের পক্ষে কি সুন্দর! অনন্তর সেই বিমলতোয়া পার্ব্বত্য নদীতে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিয়া তিনি অশ্বত্থবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন ও অনতিবিলম্বে ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহ মর্ম্মরমূর্ত্তির ন্যায় অচল, স্থির—যেন তাহা হইতে প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইয়া গিয়াছে। বদনশ্রী ধ্যানদর্শন আনন্দহিল্লোলে প্রফুল্লকমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত। তিনি বহুক্ষণ এই ভাবে রহিলেন, অনন্তর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে অখণ্ডানন্দ স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "গঙ্গাধর, আজি এই অশ্বত্থবৃক্ষতলে আমার জীবনের একটা অমূল্যক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আমার একটা প্রধান সমস্যার সমাধান হইয়াছে।" গঙ্গাধর মহারাজ চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার মুখমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় সুখরাগে রঞ্জিত। তখন তিনি স্বামীজির কি অনুভূতি হইয়াছে জানিতে পারেন

নাই, পরে স্বামীজির ডায়েরি খুলিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাতে এই ভাবের কথা লেখা আছে যে, 'আমি আজ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতা অনুভব করিয়াছি, বিশ্বের যা কিছু সব এই ক্ষুদ্র দেহমধ্যে আছে, দেখিলাম প্রতি পরমাণুমধ্যে বিশ্বসংসার বিদ্যমান।'

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে তাঁহারা আলমোড়ার অনতিদূরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন উভয়েই বহুক্ষণ হইতে অভুক্ত অবস্থায় আছেন। স্বামিজী ক্ষুধায় অবসন্ন ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। অখণ্ডানন্দ স্বামী জলের সন্ধানে গেলেন। সম্মুখেই মুসলমানদিগের একটি গোরস্থান ছিল। ঐ স্থানের রক্ষক একজন ফকির। তিনি নিকটেই পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। ঘটনাক্রমে তিনি সেই সময়ে ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। স্বামিজীর অবস্থা দর্শনে তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি একখানি শশা আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন। শশা খাইয়া তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ হইল। পরবর্ত্তীকালে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন "লোকটি বাস্তবিক সেদিন আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, কারণ আমি আর কখনও ক্ষুধায় অতটা কাতর হই নাই।" ইহার কয়েক বর্ষ পরে তিনি আমেরিকা হইতে এদেশে ফিরিয়া আসিলে যখন আলমোড়াবাসিগণ জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মহাসমারোহের আয়োজন করিয়াছিল, তখন সেই সমারোহস্রোত মধ্যে তিনি পুনরায় এই মুসলমান ফকিরের দর্শন পান। ফকির অবশ্য তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি জনতার মধ্য হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারেন ও সাদরে তাঁহাকে নিজ সকাশে আনয়ন পূর্ব্বক সমাগত জনমণ্ডলীর নিকট

তাঁহার পরিচয় দেন ও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থও দান করেন।

উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণের প্রথম অংশটী স্বামিজীর নিকট অতীব মধুর বোধ হইয়াছিল। অনাহার অনিদ্রায় দীর্ঘ পথ ভ্রমণে শ্রান্তি ও অবসাদ যথেষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অভ্রভেদী হিমালয়ের নীরব গম্ভীর সৌন্দর্য্য ও শান্ত-সমাহিত-ভাবদর্শন ও স্বচ্ছন্দচারী পার্ব্বত্য সমীরণস্পর্শে সকল ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হইয়া যাইত। কাঠ্‌গোদাম হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত এই ভাবে গেল।

আলমোড়ায় পৌঁছিয়া অখণ্ডানন্দ স্বামী তাঁহাকে অম্বাদত্তের বাগানে লইয়া গেলেন এবং সেখানে তাঁহাকে রাখিয়া সারদানন্দ ও কৃপানন্দ নামক অপর দুই গুরুভ্রাতাকে (তাঁহারা ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতে হিমালয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন) তাঁহার আগমন সংবাদ প্রদান করিতে গমন করিলেন। তাঁহারা ঐ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সোৎসাহে অম্বাদত্তের বাগানের দিকে ছুটিলেন—কিয়দ্দূর গিয়া দেখেন, স্বামীজি নিজেই আসিতেছেন। তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাদের আশ্রয়দাতা লালা বদ্রীসার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনিও সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ যোশী নামক একজন সেরেস্তা-দারের সহিত 'সন্ন্যাসগ্রহণের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে স্বামীজির সুদীর্ঘ তর্কবিতর্ক ও আলোচনা হয়। তিনি শতমুখে ত্যাগই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ইহা প্রমাণ করেন এবং স্বীয় জীবনের আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে এরূপ দৃঢ় যুক্তির সহিত ঐ বিষয়টী বুঝাইয়া দেন যে অবশেষে ব্রাহ্মণ যোশী তাঁহার সিদ্ধান্তই শিরোধার্য্য করিয়া লয়েন।

বদ্রীসার বাটীতে অবস্থানকালে * একদিন সন্ধ্যার সময় একটী

* এ ঘটনাটী এই সময়ে সংঘটিত হয় নাই। সম্ভবতঃ আমেরিকা হইতে

অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়। তাঁহারা বসিয়া আছেন এমন সময়ে গ্রামের মধ্যে খুব মাদলের শব্দ শোনা গেল এবং কিঞ্চিৎ পরেই স্থানীয় এক ব্যক্তি আসিয়া বদ্রীসাকে বলিল 'মহাশয় শীঘ্র আসুন, একজনকে ভূতে পাইয়াছে।' বদ্রীসা তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। স্বামিজীও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিটী শুইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে এবং তাহার চারি পার্শ্বে কতকগুলি লোক বসিয়া তাহার হাত পা চাপিয়া ধরিয়াছে। আর এক ব্যক্তি (বোধ হয় পুরোহিত বা রোজা) ভূত ছাড়াইবার জন্য মন্ত্র আওড়াইতেছে ও মাঝে মাঝে একখানা অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত কুঠার লইয়া তাহার শরীরের স্থানে স্থানে ছ্যাঁকা দিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ কুঠার দ্বারা তাহার কেশ বা অঙ্গ স্পর্শ করিলেও কোন স্থান দগ্ধ হইতেছে না, এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া স্বামিজী অবাক্ হইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল ও গৈরিক বসনধারী মাত্রেই অদ্ভুত শক্তিমান এই বিশ্বাসে বলিল 'মহারাজ, আপনি দয়া করিয়া এই ব্যক্তিকে সুস্থ করুন।' স্বামীজি শুধু ব্যাপারটী কি দেখিতে গিয়াছিলেন, স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে তাঁহাকে আবার রোজা হইয়া ভূত ছাড়াইতে হইবে। কিন্তু কি করেন লোকগুলির কাকুতি মিনতিতে অগত্যা উপদেবতাবিষ্ট লোকটির নিকট অগ্রসর হইতে হইল। তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে কুঠারখানি পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেটী তখন প্রায় স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে তথাপি যেমন তিনি তাহাতে হাত দিয়াছেন অমনই হাত পুড়িয়া গেল। তিনি তখন ভূত ছাড়াইবেন কি নিজেই অস্থির! যাহা

ফিরিবার পর যখন দ্বিতীয় বার আলমোড়ায় আসেন, সেই সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল।

হউক কিঞ্চিৎ পরে নিজের জ্বালা চাপিয়া রাখিয়া ভূতগ্রস্ত লোকটীর মস্তকের উপর করস্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে কিয়ৎক্ষণ স্বীয় ইষ্টনাম জপ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ঐরূপ করিবার দশ বার মিনিটের মধ্যেই লোকটা সুস্থির হইল এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ শান্ত ও সুস্থভাব ধারণ করিল। স্বামিজী বলিতেন "তারপর আমার উপর গাঁয়ের লোকের ভক্তি দেখে কে! আমায় একটা কেষ্ট বিষ্টু ঠাওরালে। আমি কিন্তু ব্যাপারখানার কিছুই বুঝতে পারলুম না। অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে আশ্রয়দাতার সঙ্গে তাঁর কুটীরে ফিরে এলুম। তখন রাত প্রায় ১২টা। এসেই শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু হাতের জ্বালায় আর ঐ ব্যাপারের রহস্য উদ্ভেদের চিন্তায় সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। জ্বলন্ত কুঠারে মানুষের শরীর দগ্ধ কর্ত্তে পাল্লে না দেখে কেবলই মনে হতে লাগল 'There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy'—পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক ব্যাপার আছে যার সন্ধান দর্শনশাস্ত্রে মেলে না।"

আলমোড়ায় কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার এক সহোদরার শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ সম্বলিত একখানি টেলিগ্রাম আসিল। উহা পাইবামাত্র স্বামিজীর হৃদয় দুঃসহ শোকে মুহ্যমান হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহাই আবার তাঁহার চিত্তকে এ দেশের নারীজাতির উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণে সজাগ করিয়া তুলিল। কিন্তু এই আকস্মিক পারিবারিক দুর্ঘটনায় বিশেষ ব্যথিত হইলেও তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন না। যেই দেখিলেন বাটীর লোকেরা তাঁহার সন্ধান পাইয়াছেন অমনি তাঁহার অন্তর্নিহিত সন্ন্যাসভাব আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন এ স্থান ত্যাগ করিয়া অধিকতর দুর্গম গিরিগহ্বরে আশ্রয় করিতে হইবে।

তাহাই হইল। একদিন হঠাৎ সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও কৃপানন্দকে লইয়া বদ্রীসার বাটী ত্যাগ করিয়া গাড়োয়াল রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা কর্ণপ্রয়াগ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়া এক চটীতে বিশ্রামকালে স্বামিজী সহসা প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। সেই ভাবে চটীতে তিন দিন কাটিল, তারপর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াই তিনি রুদ্রপ্রয়াগে যাত্রা করিলেন। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অনির্ব্বচনীয়। চতুর্দ্দিক স্তব্ধ জনহীন—যেন গভীর শান্তির রাজ্য। কেবল মাঝে মাঝে গিরিনির্ঝরিণীর কলহাস্য-ময় নৃত্য ও দূরাগত প্রতিধ্বনির ক্ষীণশব্দ। চির-শুভ্র হিমালয়ের অপ-রূপ সৌন্দর্য্য দর্শনে স্বামিজীর বাল্য ও যৌবনের স্বপ্ন সম্পূর্ণ সার্থক হইল। রুদ্রপ্রয়াগে পূর্ণানন্দ নামে একজন বাঙ্গালী সাধুর সহিত তাঁহার দেখা হইল। তাঁহার আশ্রমেই সকলে রাত্রিবাস করিলেন। এই স্থান হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর স্বামিজীর আবার জ্বর হইল। এবার চটীর অপেক্ষা বিষম জ্বর। তাঁহার এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া সেখানকার কাছারীর আমীন দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে একটী কবিরাজী ঔষধ খাইতে দিলেন এবং তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে দাণ্ডীতে করিয়া তাঁহাকে শ্রীনগরে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তিনি ক্রমে ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলেন। তখন তাঁহাদের আলমোড়া হইতে ১২০ ও কাঠ্‌গোদাম হইতে ১৬০ মাইল ভ্রমণ সমাধা হইয়াছে। পাঠকের মনে থাকিতে পারে, কাঠ্‌গোদাম হইতেই তাঁহারা বদরিকার পথে যাত্রা আরম্ভ করেন। আলমোড়া হইতে এই পথটি আসিতে তাঁহাদের দুই সপ্তাহেরও উপর লাগিয়াছিল, কারণ তাঁহারা ভিক্ষা, ধ্যান ও ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন।

শ্রীনগরে আসিয়া অলকনন্দা নদীর তীরে একটী নির্জ্জন কুটীরে

তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। শুনিলেন পূর্ব্বে শ্রীমৎ তুরীয়ানন্দ স্বামী এই কুটীরে বাস করিতেন। এখানে তাঁহারা প্রায় মাসাবধি বাস করিলেন ও মাধুকরী-ভিক্ষা দ্বারা দিনপাত করিতে লাগিলেন। ভ্রমণকালে ও বিশেষতঃ এই স্থানে স্বামিজী গুরুভ্রাতাদিগের চিত্তে উপনিষদের উপদেশগুলি বিশেষভাবে বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দিনের পর দিন শ্রীনগরে এই কুটীরে বসিয়া তাঁহারা প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের নিকট প্রকাশিত সেই সকল গভীর তত্ত্বকথা আলোচনা করিতে করিতে অবশেষে তাঁহাদের ভাবে একেবারে তন্ময় হইয়া উঠিতেন। শ্রীনগরে অবস্থানকালে বৈশ্য জাতীয় একজন স্কুল মাষ্টারের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। এ ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে। স্বামিজী তাহার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা তথ্য আলোচনা করিতে লাগিলেন, সে ব্যক্তিও তাঁহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিল।

শ্রীনগরে বহুল সাধনা ও ধ্যান ভজনের পর স্বামিজী টিহিরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে মোটে আহার মিলিল না, কারণ চতুর্দ্দিক নিবিড় জঙ্গলপূর্ণ। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন চতুর্দ্দিক ধূসরশ্রী ধারণ করিয়াছে সেই সময়ে তাঁহারা অবসন্নদেহে একখানি গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা একস্থানে সকলে মিলিয়া বসিলেন—চারিদিকে গ্রামবাসীদের বাটী, তাঁহাদের মধ্যে একজন ভিক্ষা করিতে গেলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও কিছুই মিলিল না। শেষে তাঁহাদের 'গাড়োয়াল সরীখা দাতা নেহী, লাঠ্‌ঠি বেগর দেতা নেহী, (গাড়োয়ালবাসীদের মত দাতা নাই কিন্তু তাহারা লাঠি ব্যতীত ভিক্ষা দেয় না) এই স্থানীয় প্রবাদ বাক্য মনে পড়িল। তখন তাঁহারা ঐ প্রবাদ বাক্যের পরীক্ষার্থ কৌতুকপরবশ হইয়া সকলে মিলিয়া 'এই পাধান (প্রধান) রোটী ল্যাও,

লকড়ি ল্যাও' বলিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে হাঁকিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার, দেখিলেন কতকগুলি বলিষ্ঠদেহ গ্রামবাসী নিরীহ মেষশিশুর ন্যায় ধীরে ধীরে আমতণ্ডুলাদি লইয়া তাঁহাদের নিকট সমাগত হইল। কিন্তু তখন সন্ন্যাসীরা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন, পাক করিয়া খাইবার ধৈর্য্য ও সামর্থ্য নাই। সুতরাং বলিলেন 'ও সব চাই না, রন্ধন করা খাদ্যসামগ্রী লইয়া আইস।' অগত্যা গ্রামবাসীরা রন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। তখন ঐ কৌতুককর ব্যাপার লইয়া তাঁহারা খুব হাসিতে আরম্ভ করিলেন ও রন্ধন সমাপ্ত হইলে প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় মহা তৃপ্তির সহিত উদর পূরিয়া আহার করিলেন। আহারান্তে গ্রামবাসীদিগের সহিত ধর্ম্ম ও তাহাদের রীতিনীতি সম্বন্ধে বহুবিধ আলাপ করিয়া সে রাত্রি সেইখানেই কাটাইলেন।

টিহিরি আসিয়া একটা পড়ো বাগানে দুটী ঘর মিলিল। সাধুদের জন্যই ঘর দুটী তৈরী। এখানে গঙ্গার তীরে বসিয়া তাঁহারা অহরহ ধ্যানধারণায় যাপন ও ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। এখানে টিহিরি-রাজের দেওয়ান (সুপ্রসিদ্ধ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অগ্রজ) শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত স্বামিজীর পরিচয় হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী গণেশপ্রয়াগে (গঙ্গা ও ভিলাঙ্গন নদীর সঙ্গমস্থলে) তাঁহার সাধনার স্থান পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু তাঁহার সংকল্পমত কার্য্য হইল না, অখণ্ডানন্দ স্বামী কিছুদিন হইতেই সর্দ্দি জ্বর কাশি প্রভৃতিতে কষ্ট পাইতেছিলেন, এক্ষণে টিহিরির নেটিভ-ডাক্তার বলিলেন, তাঁহার bronchitis হইবার খুব সম্ভাবনা, পার্ব্বত্য-বায়ু তাঁহার সহ্য হইবে না, কারণ উহা অতিশয় লঘু। তাহার উপর আবার সামনেই শীত আসিতেছে। সুতরাং এ সময়ে তাঁহারা যত শীঘ্র নীচে নামিয়া যাইতে পারেন ততই মঙ্গল। এরূপ

আশঙ্কার কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতার জীবনরক্ষার জন্য স্বামীজি স্বীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া দেরাদুনে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। টিহিরি ত্যাগ করিয়া মুসৌরীর মধ্য দিয়া তাঁহারা রাজপুরে গেলেন। এখানে অপরাহ্নে দূর হইতে একজন সাধুকে তুরীয়ানন্দ বলিয়া বোধ হওয়ায় তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে সাধুটীকে ডাকিতে লাগিলেন এবং তিনি নিকটে আসিলে দেখিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দই বটে। সহসা এইরূপ আকস্মিক ভাবে একজন প্রিয় গুরুভ্রাতার দর্শন পাইয়া সকলে মহা আহ্লাদিত হইলেন এবং পরস্পরের ভ্রমণকাহিনী কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন নবরাত্রির একদিন মাত্র বাকি আছে। তারপর সকলে একত্রে দেরাদুনে পৌঁছিয়া সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার ম্যাকলারেনের নিকট অখণ্ডানন্দের বক্ষ পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ বাবু উক্ত ডাক্তার সাহেবের নিকট একখানি পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। সাহেব স্বামিজীর সহিত ধর্ম্মবিষয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া তাঁহার ও তাঁহার সহচর সন্ন্যাসিগণের বিশেষ গুণানুরাগী হইয়া পড়িলেন। তাহার পর অতিশয় যত্নের সহিত অখণ্ডানন্দ স্বামীর বক্ষ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন 'আর কিছুতেই উপরে উঠিও না, দীর্ঘকাল সমতল প্রদেশে থাকিয়া ভালরূপ চিকিৎসা করাও।' কিন্তু প্রথমেই একটা আশ্রয় চাই, নতুবা কোথায় চিকিৎসা হয়? স্বামিজী নিজে দেরাদুনের বহু বাটীতে গমন করিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও আশ্রয় মিলিল না। তিনি তথাপি নিরস্ত না হইয়া দ্বারে দ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ নামে একজন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ ও স্থানীয় উকীল পীড়িত সাধুটীকে আশ্রয়দান ও তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যবহারের জন্য

গরম কাপড় ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অখণ্ডানন্দ স্বামীর এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে আর সকলে কোন বণিকের নূতন নির্ম্মিত বাটীতে চারিখানি খাটিয়া পাতিয়া ভিক্ষান্ন সেবনে কয়েকটা দিন কাটাইলেন।

এখানে একজন জাতবেনের সহিত স্বামিজীর দেখা হয়। তাহার ধারণা ছিল, সে একজন মহা বৈদান্তিক। "মহারাজ, পাঁচ মিনট্‌মে তত্ত্ব খিঁচ লিয়া হ্যায়। জগৎ তিন কালমে হ্যায়ই নেহী। তুসীতো স্বরূপ হ্যায়"—এইরূপ ভাবের কথা সর্ব্বদা তাহার মুখে শুনা যাইত। লোকটী কিন্তু এদিকে মহা কৃপণ ছিল। সে "নন্দ গাঁটা" (অর্থাৎ গাঁইট বন্ধনপটু কৃপণ নন্দ) বলিয়া পরিচিত ছিল। স্বামিজী ইহার সহিত মাঝে মাঝে আলাপ করিতেন ও ইহার কথায় বিশেষ কৌতুক অনুভব করিতেন। ইহার পুত্রের সহিত স্বামিজীর পরিচয় হওয়ায় সে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ইঁহাদিগকে খাওয়াইয়াছিল। কৃপণ নন্দ বাটীতে আসিয়া দেখে, ইঁহারা তাহার বাটীতে খাইতেছেন। দেখিয়া সে বিস্মিত হইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

একদিন হৃদয়বাবু নামক একজন খ্রীষ্টানের (ইনি পূর্ব্বে স্বামিজীর সহিত একত্রে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন) বাটীতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের সহিত কথায় কথায় মহা তর্ক বাধিয়া গেল। স্বামিজী তাহাদিগের নিকট বাইবেলের higher criticismএর ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহারা কস্মিন্ কালেও উহার ধার ধারে নাই, সুতরাং তাঁহার যুক্তিতর্কের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহারা বিস্মিত হইল। স্বামিজী তাহার পর হৃদয়বাবুকে তাঁহার বাটীতে বসিয়া তাঁহার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আলোচনা করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

দেরাদুনে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হইলে স্বামিজী অখণ্ডানন্দকে এলাহাবাদে এক বন্ধুর বাটীতে যাইতে পরামর্শ দিয়া ও কৃপানন্দের উপর তাঁহার সেবা ও তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ করিয়া অপর গুরুভ্রাতা-দিগের সহিত হৃষীকেশ যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে কৃপানন্দও হৃষীকেশ গেলেন। অখণ্ডানন্দ কতকটা সুস্থ হইলে এলাহাবাদে যাইবেন মনে করিয়া প্রথমে সাহারাণপুরে বন্ধুবাবু নামক একটী বাঙ্গালী উকিলের নিকট গমন করিলেন, তাঁহার পরামর্শে তিনি মীরাটে তাঁহার আলাপী ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাটীতে গেলেন। সেখানে প্রায় দেড়মাস তাঁহার চিকিৎসা চলিল।

এদিকে স্বামিজী হৃষীকেশে আসিয়া মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া খাইতে লাগিলেন ও গুরুভাইদের সহিত তথাকার বিখ্যাত সাধু ধনুরাজ গিরির বাড়ী বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কঠোর সাধনার ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে পুনরায় তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। কয়েকদিন তপস্যার পর একদিন তিনি প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল, গুরুভ্রাতারা চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। একদিন এমন হইল যে, ক্রমাগত ঘর্ম্মনিঃসরণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল ও নাড়ীত্যাগ হইল। তিনি মাটীতে দুখানি পাটকরা কম্বলের উপর অজ্ঞান অচৈতন্যভাবে পড়িয়া আছেন। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। গুরুভ্রাতারা চিন্তায় ও শোকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, কারণ বহু ক্রোশের মধ্যে ডাক্তার কবিরাজ বা চিকিৎসার কোন উপায় নাই। এই ঘোর বিপদে পড়িয়া যখন তাঁহারা একমনে মধুসূদনকে স্মরণ করিতেছেন সেই সময়ে হঠাৎ কুটীরের বহির্দ্দেশে কাহার ধীর পদক্ষেপ শ্রুত হইল। তাঁহারা চকিত হইয়া দেখিলেন

কুটীরদ্বারে এক সাধু দণ্ডায়মান। তাঁহারা তাঁহাকে সাগ্রহে অভিবাদন করিয়া গৃহমধ্যে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার নিকট স্বামিজীর সকল অবস্থা বর্ণনা করিলেন। মহাপুরুষ সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া থলি হইতে কিঞ্চিৎ মধু ও পিপুলচূর্ণ একত্রে মাড়িয়া স্বামিজীকে খাওয়াইয়া দিলেন। কি আশ্চর্য্য! ঔষধটি যেন অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিল; কারণ ক্ষণকাল মধ্যেই স্বামিজী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিলেন। একজন গুরুভাই তাঁহার মুখের নিকট কান পাতিলে তিনি অতি ক্ষীণস্বরে দু একটী কথা কহিলেন। ক্রমে তিনি অল্প অল্প করিয়া সুস্থ হইতে লাগিলেন। পরে তিনি সঙ্গীদের নিকট বলিয়াছিলেন যে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকার সময় তিনি যেন দেখিয়াছিলেন যে জগতে তাঁহাকে বিধাতার কোন একটা বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে এবং সেই কার্য্য যতদিন না শেষ হইবে ততদিন তাঁহার বিশ্রাম বা শান্তি নাই। বাস্তবিক তাঁহার গুরুভাইরা এই সময় হইতে তাঁহার মধ্যে একটা বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সে শক্তির বেগ এত প্রবল যে মনে হইত তাহা আর তাঁহার ভিতরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। তিনি সেই শক্তি বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

হৃষীকেশে যখন সাংঘাতিক পীড়ায় ভুগিয়া তাঁহার জীবনের আশা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখনই গুরুভাইরা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন স্বামিজী তাঁহাদের কতদূর স্নেহ ভালবাসার বস্তু। তাঁহাদের প্রাণে প্রতিমুহূর্ত্তে বাজিতেছিল—শ্রীগুরুদেবের অদর্শনাবধি ইনিই আমাদের বল বুদ্ধি ভরসা, এখন যদি আবার ইঁহাকেও হারাই তবে আমাদের উপায় কি হইবে? কিন্তু ঠিক এই সময়েই স্বামিজীর সংকল্প হইল যে তাঁহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল করিতে হইবে, তাঁহারা

যেন আর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া না চলেন। যাহা হউক, হৃষীকেশে আরও কিছুদিন বাস হইল। প্রথমে কিছুদিন তাঁহারা এক ঝুপড়িতে বাস করিয়াছিলেন—যে ঝুপড়িতে স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি পূর্ব্বে হৃষীকেশ বাসের সময় ছিলেন। পরে ইঁহাদের পূর্ব্ব পরিচিত শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখানে আসিলে তাঁহার অর্থ সাহায্যে একটী ভাল কুটীর নির্ম্মিত হইল এবং তাহাতে ইঁহারা কিছুদিন বাস করিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মসূত্র খুব আলোচনা হইতে লাগিল—চারিদিকে রটিয়া গেল, একজন খুব পণ্ডিত সাধু এখানে আসিয়াছেন। এখানে শঙ্করগিরি নামক একজন সুপ্রাচীন সাধুর সহিত স্বামীজির আলাপ হয়—তিনি স্বামীজির সঙ্গে কথা কহিতে বড়ই আনন্দ পাইতেন—বলিতেন, পণ্ডিতের কথা ছেড়ে দাও, কথা বোঝে, এমন লোক কোথা? 'বাত সমুঝে এসা আদমি কাঁহা মিলে' স্বামিজীকে 'ইয়ার' ও 'রসিলা' বলিতেন—অর্থাৎ ইঁহার সহিত কথা কহিয়া বাস্তবিক সুখ হয়। ইনি হৃষীকেশে অনেকদিন হইতে ছিলেন—গল্প করিতেন—তখন এখানে রীতিমত জঙ্গল ছিল, পালে পালে হাতী আসিত। এখন কি আর হৃষীকেশ আছে, 'রোটিকেশ' হইয়াছে অর্থাৎ এখন ছত্রাদিতে রুটির বন্দোবস্ত খুব হইয়াছে, তাই অনেক সাধু এখানে থাকেন। ইনি স্বামিজীর নিকট সেই জ্ঞানী সাধুর গল্প করেন, যাঁহাকে বাঘে লইয়া যাইবার সময় ক্রমাগত শিবোহং শিবোহং ধ্বনি করিতেছিলেন। যাহা হউক, স্বামিজী অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিলে সকলে মিলিয়া কনখলে রাখালের (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) সহিত মিলিত হইয়া শাহারাণপুরে বঙ্কুবাবু উকীলের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন যে, গঙ্গাধর মীরাটে আছেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামী বহুদিন গঙ্গাধর মহারাজকে দেখেন নাই, আর বঙ্কুবাবুও বিশেষ করিয়া বলিলেন,

মীরাটে কিছুদিন থাকিলে স্বামিজীর শরীর সারিয়া যাইবে—সুতরাং ব্রহ্মানন্দ স্বামীর বিশেষ আগ্রহে ও বন্ধুবাবুর বিশেষ অনুরোধে সকলে মিলিয়া মীরাটে গমন করিলেন।

মীরাটে আসিয়া তাঁহারা সকলে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময়টা ৺কালীপূজার পর। শরতের শেষ। অখণ্ডানন্দ স্বামিজীর রুগ্ন শীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি বলেন 'স্বামিজীকে ওরূপ ক্ষীণ শীর্ণ কখনও দেখি নাই, ঠিক যেন একখানি ছায়ামূর্ত্তির মত হইয়া গিয়াছিলেন, বেশ বোধ হচ্ছিল যে হৃষীকেশের পীড়ার কবল হইতে তখনও তিনি সম্পূর্ণ উদ্ধারলাভ করিতে পারেন নাই।' তাঁহারা উভয়ে প্রায় দুই সপ্তাহ ত্রৈলোক্যবাবুর বাটীতে থাকিলেন। অপর সকলে যজ্ঞেশ্বর* বাবু বলিয়া একজন ভদ্র-লোকের বাড়ীতে স্থান পাইলেন। পরে সকলে একত্রে যজ্ঞেশ্বর বাবুর কোন বন্ধুর বাগানে (উহা শেঠজীর বাগান নামে খ্যাত ছিল) আশ্রয় লইলেন। স্বামিজী তখনও ঔষধ খাইতেছিলেন। যাহা হউক মীরাটে থাকিতে থাকিতে তিনি ক্রমশঃ বল লাভ করিলেন।

শেঠজীর বাগানে থাকার সময়ে অখণ্ডানন্দ তাঁহার নিকট তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত কাবুলের আমীরের এক আত্মীয়কে আনয়ন করেন। এই ভদ্রলোক স্বামিজীকে দেখিতে আসিবার সময় উজু (নমাজের পূর্ব্বে হস্তপদাদি প্রক্ষালন) করিয়া পবিত্রভাবে প্রচুর মিষ্টান্নাদি উপঢৌকন লইয়া আসিতেন। স্বামিজী তাঁহার সহিত খ্যাতের সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির আখুন্দের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা কন। অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও স্থানীয় অন্যান্য লোক স্বামিজীর নিকট ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শ্রবণ-

* ইনি এক্ষণে ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের অন্যতম নেতা স্বামী জ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত।

মানসে আসিতেন। বাস্তবিক জায়গাটী যেন একটি ছোটখাটো বরাহ-নগর মঠ হইয়া দাঁড়াইল; স্বামিজী, ব্রহ্মানন্দ, অখণ্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, কৃপানন্দ সকলেই ছিলেন, তার উপর হঠাৎ অদ্বৈতানন্দ কোথা হইতে আসিয়া জুটিলেন। স্বামিজীর শরীর ক্রমশঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেল। তিনি প্রত্যহ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রামকালে মৃচ্ছকটিক, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি পাঠ করিয়া গুরুভাইদিগকে শুনাইতেন, বিষ্ণুপুরাণও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ধ্যান ভজন খুব চলিত; সকলে মিলিয়া রন্ধনাদি করা হইত, স্বামিজীও কখন কখন তাহাতে সাহায্য করিতেন। মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিক বেড়াইতে যাওয়া হইত। বস্তুতঃ মীরাটে তাঁহাদের জীবনের কয়েকটী অতি সুখের দিন কাটিয়াছিল।

স্বামিজী স্থানীয় সাধারণ পুস্তকাগার হইতে পুস্তকাদি আনাইয়া পাঠ করিতেন। ঐ উপলক্ষে একটী কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার স্যার জন লবকের গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড প্রত্যহ শেষ করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র গ্রন্থাবলী শেষ হইয়া গেলে লাইব্রেরীয়ান মনে করিলেন তিনি কখনই সব বইগুলি পড়েন নাই, শুধু লোক দেখাইবার জন্য পড়িবার ভাণ করিতেছেন মাত্র। স্বামিজীর নিকট ঐ সন্দেহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, আমি সব পুস্তকগুলিই আয়ত্ত করিয়াছি, আপনি ইচ্ছা করিলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন। লাইব্রেরীয়ান তখন তাঁহাকে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এত শীঘ্র কিরূপে পাঠ করেন জিজ্ঞাসা করাতে স্বামিজী অখণ্ডানন্দ স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "আমি এক একটী শব্দের দিকে নজর দিয়া পড়ি না, এক একটী বাক্য একেবারে পড়িয়া যাই।"

মীরাটে তিন মাসেরও অধিককাল যাপন করিয়া স্বামিজী হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানের সর্ব্বত্যাগী সাধুদিগের ন্যায় পূর্ণ স্বাধীনতা-ভোগের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি এই সব সাধুদিগের সম্বন্ধে বলিতেন—"হৃষীকেশে আমি অনেক মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছিলাম, একজনের কথা মনে আছে তিনি উন্মাদভাবে থাকিতেন, এবং রাস্তা দিয়া উলঙ্গ হইয়া চলিয়াছেন, আর ছোঁড়ারা পশ্চাতে দৌড়াইতেছে, ও ঢিল ছুঁড়িতেছে। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া দরদরধারায় রক্ত পড়িতেছে, তথাপি ভ্রুক্ষেপ নাই—বরং হাসিয়াই খুন! আমি তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আহত স্থানগুলি ধোয়াইয়া দিই ও একটু ন্যাকড়া পুড়াইয়া তাহার ছাই সেই সব স্থানে লাগাইয়া দিই, তবে রক্ত থামে। তিনি কিন্তু ক্রমাগত হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন 'কেয়া মজেদার খেল্ হ্যায়! বিলকুল বাবাকা খেল্! কেয়া আনন্দ!' ইত্যাদি। আবার অনেক সাধু আছেন তাঁহারা লোকজনের সঙ্গ ভালবাসেন না, লুকাইয়া থাকিতে চাহেন। আত্মগোপনের কৌশলগুলিও আবার চমৎকার। কেহ বা গুহার চতুর্দ্দিকে মনুষ্যের কঙ্কাল ছড়াইয়া রাখিয়াছেন—তাহা দেখিয়া লোকে ভাবে তিনি সর্ব্বভুক্। কেহ বা লোক দেখিলেই প্রস্তর নিক্ষেপ করেন—এইরূপ।" এই সব সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে স্বামিজী আরও বলিতেন "ইঁহাদের তপস্যা, তীর্থযাত্রা বা পূজাদির কোন প্রয়োজন নাই, তবে যে ইঁহারা তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ান ও তপস্যাদি কঠোর অনুষ্ঠান করেন সে শুধু নিজ নিজ পুণ্যবলে লোককল্যাণ সাধনের জন্য।" তিনি নিজেও এখন এইরূপ লোককল্যাণ কামনায় নির্জ্জন সাধনার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। বোধ হয় তিনি এ সম্বন্ধে স্বীয় ইষ্টদেবতার নিকট হইতে কোনরূপ আদেশও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কারণ এই সময়ে তিনি গুরুভ্রাতাদের সকলকে ডাকিয়া একদিন বলিলেন—'আমার জীবনব্রত স্থির হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে আমি একাকী অবস্থান করিব। তোমরা আমায় ত্যাগ কর।' অখণ্ডানন্দ অনেক অনুনয় প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহিত থাকিবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি বলিলেন 'গুরুভাইদের মায়াও মায়া, বরং আরও প্রবল। এ মায়ার পাকে পড়িলে কার্য্যসাধনের বহু বিঘ্ন ঘটিবে। আমি আর কোন মায়ার বেড়ী রাখিতে চাহি না।' এ সঙ্কল্প শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একদিন প্রাতঃকালে তিনি সকলকে ত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে গমন করিলেন।

আলোয়ার রাজ্যে

হিন্দুমুসলমানের পুরাতন রাজধানী দিল্লী নগরী অতীতের বহু স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আজও শত শত ভুবন-পর্য্যটকের মনোহরণ করিয়া থাকে। ইউরোপখণ্ডে রোম নগরী যেমন গরীয়সী সভ্যতার খনি, ভারতখণ্ডে দিল্লী নগরীও তেমনি। উহার বিগত গৌরব স্মরণে স্বামিজীর ভাবোন্মত্ত প্রাণ নাচিয়া উঠিল। দিল্লীতে তিনি শ্যামলদাস শেঠের বাটীতে গিয়া উঠিলেন। সেখানে তাঁহার দর্শনমাত্র সকলে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। কিছুদিন পরে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনের সহিতও তাঁহার আলাপ হইল। উক্ত হেমবাবুর সহিত স্বামিজীর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহু তর্কবিতর্ক হয়, হেমবাবু স্বামিজীর অগাধ বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

গুরুভ্রাতাগণ মীরাটে তাঁহাকে বিদায় দিয়া অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। শীঘ্রই সকলে আবার দিল্লীতে তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার প্রাণে নির্জ্জন ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দিল্লীতে তিনি যে কয়দিন একাকী ছিলেন বেশ সুখেই ছিলেন। কারণ সেটী তাঁহার তৎকালীন মনোমত অবস্থা। তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন যেন কোন উচ্চশক্তি তাঁহাকে নিঃসঙ্গ বিচরণের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, কে যেন তাঁহাকে আদেশ করিতেছিল—'এই কর।' সুতরাং কিছুদিন গুরুভাইদিগের সহিত একসঙ্গে কাটাইয়া আবার একলা বাহির হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার অজ্ঞাতবাস আরম্ভ হইল। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার অনুসরণ

করিয়াছিলেন এবং এক আধবার মাত্র তাঁহার সহিত, একবার স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত ও একবার স্বামী অভেদানন্দের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহার সন্ধান করিতে করিতে এক এক স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিতেন, তিনি কয়েকদিন পূর্ব্বে সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে তিনি স্বামিজীর এই সময়কার ভ্রমণের কতক কতক ঘটনা অবগত হন। পরে স্বামিজীও গুরুভাইদের নিকট এই সময়কার কিছু কিছু গল্প করেন। এই সময়ে যে সকল ব্যক্তির সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাদেরও মধ্যে কেহ কেহ পরে তাঁহাদের সহিত স্বামিজীর কিরূপে মিলন হইল ও কিরূপ আলাপাদি হইয়াছিল, তাহা গল্পচ্ছলে বলেন বা লিপিবদ্ধ করেন। এই সমুদয় উপাদান হইতেই স্বামিজীর এই অজ্ঞাতবাসের পূর্ব্বাপর একটা বিবরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

দিল্লী ত্যাগ করিয়া স্বামিজী রাজপুতনার অন্তর্গত আলোয়ার প্রদেশে গমন করিলেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর প্রথম ভাগে একদিন প্রাতঃকালে স্বামিজী ট্রেণ হইতে আলোয়ার ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। শ্যাম-শষ্পাবৃত ভূমি ও উদ্যানরাজিবেষ্টিত রাজপথ বাহিয়া বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাশ্রেণী অতিক্রম করতঃ অবশেষে তিনি সরকারী চিকিৎসালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার দ্বারদেশে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহাকেই ডাক্তার বাবু অনুমানে বঙ্গভাষায় সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'মহাশয় এখানে সাধু সন্ন্যাসীর থাকিবার কি একটু স্থান হ'তে পারে ?' ভদ্রলোকটী প্রকৃতই সেখানকার ডাক্তার, নাম গুরুচরণ লস্কর। অনেক দিন বিদেশে আছেন, বাঙ্গালা কথা বড় শ্রুতিগোচর হয় না, সুতরাং এই কমনীয়

বদন তরুণ সন্ন্যাসীর মুখ হইতে হঠাৎ বাঙ্গালা কথা শুনিয়া বড় আনন্দ পাইলেন, এবং তাঁহাকে সসম্মানে প্রণাম করিয়া উত্তর করিলেন—'নিশ্চয়! আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন' এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চিকিৎসালয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বাজারের উপর একখানি দ্বিতল গৃহ দেখাইয়া বলিলেন,—'আপাততঃ এইখানে থাকিতে কষ্ট হবে কি?' স্বামিজী আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, 'কিছু না।' ডাক্তার বাবু তৎক্ষণাৎ কয়েকটী প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনাইয়া দিলেন, কারণ স্বামিজীর সঙ্গে তখন একখানি গেরুয়া কাপড়, একটী দণ্ড, একটী কমণ্ডলু ও কম্বলে-বাঁধা ২।৪ খানা বই ব্যতীত আর কিছু ছিল না। বন্দোবস্তাদি শেষ করিয়া ডাক্তার তাঁহার একজন মুসলমান বন্ধুর (তিনি স্থানীয় হাই-স্কুলের উর্দ্দূ ও ফার্সির শিক্ষক ছিলেন) নিকটে গিয়া বলিলেন,—'মৌলবী সাহেব! এইমাত্র একজন বাঙ্গালী দরবেশ এখানে আসিয়াছেন, দেখিবেন ত শীঘ্র আসুন। এমন মহাত্মা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আপনি তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলুন, আমি একটু কার্য্য সারিয়া আসি।' মৌলবী সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইয়া নগ্নপদে তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ভক্তিসহকারে তাঁহাকে সেলাম করিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে আপনার নিকট যত্নপূর্ব্বক বসাইয়া ধর্ম্ম-বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, 'কোরাণের এই দুইটী বিশেষত্ব যে আজ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে কেহ কলম চালাইতে পারে নাই। ১১০০ বৎসর পূর্ব্বেও ইহা যেমন ছিল, আজও ঠিক সেইভাবে রহিয়াছে। কোথাও একটী নূতন কথা বসে নাই। প্রাচীন পুস্তকের এইরূপ বিশুদ্ধতা-রক্ষা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।' গুরুচরণ ডিস্পেন্সারীতে ফিরিয়া গিয়া সমাগত লোকদিগের নিকট স্বামিজীর আগমনবার্ত্তা

কহিলেন। ডাক্তার বাবুর মুখে ঐ কথা শুনিয়া সহরের অনেক ভদ্রলোক স্বামিজীকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবুও দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহাকে আপন আবাসে লইয়া গেলেন এবং ভোজনান্তে পুনরায় সেই কুঠুরিতে ফিরিয়া আসিলেন। লোক-সমাগম ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। মৌলবী সাহেবের মুসলমান বন্ধুগণ পর্য্যন্ত দলে দলে আসিয়া স্বামিজীর মুখে ঐশ্বরীয় কথা শুনিয়া চরিতার্থ হইতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতে দিতে মাঝে মাঝে উর্দ্দু গান, হিন্দী ভজন ও বাঙ্গালা কীর্ত্তন এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকগণের পদাবলী গাহিতেন। কখনও বা উপনিষদ্, পুরাণ, কোরাণ ও বাইবেলাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বচনাবলী উদ্ধৃত করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ শঙ্কর রামানুজ নানক চৈতন্য তুলসীদাস কবীর রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনের নানা ঘটনা শাস্ত্রোক্ত বচনের প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করিয়া সকলকে ধর্ম্মের সার শিক্ষা প্রদান করিতেন।

এইরূপে দুই তিন দিন কাটিলে পর জনকয়েক বর্দ্ধিষ্ণু লোক পরামর্শ করিলেন যে, স্বামিজীকে নগরের মধ্যস্থলে কাহারও বাটীতে রাখিলে সকলেরই তথায় যাইয়া তাঁহাকে দর্শন ও সেবা করিবার সুবিধা হইতে পারে। এই স্থির করিয়া তাঁহারা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী ইঞ্জিনিয়ার পণ্ডিত শম্ভুনাথজীর বাটীতে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। এখানে তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া বেলা নয়টা পর্য্যন্ত ধ্যান-ভজনাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। তার পর গৃহের বাহিরে আসিয়া লোকজনের সহিত আলাপ করিতেন। প্রতিদিন দশ পনর হইতে পঁচিশ ত্রিশ জন লোক তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। তন্মধ্যে ইতর, ভদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, যুবা, বৃদ্ধ, শিয়া, সুন্নি, শৈব, বৈষ্ণব সকল শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া

যাইত। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত এই জনতা সমভাবে বর্ত্তমান থাকিত। স্বামিজীর মুখের বিরাম নাই, যাহার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনিও সকলের প্রশ্নের সমান উত্তর দিতেছেন। এক এক সময়ে এমন হইত যে তিনি জ্ঞানভক্তি-বৈরাগ্যাদি উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে হয়ত একজন অবিবেচক শ্রোতা তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়া প্রশ্ন করিল, 'মহারাজ, আপ্‌কা শরীর কিস্ জাতিকা হ্যায়?' অন্য কেহ হইলে সম্ভবতঃ এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দিত না, কিন্তু স্বামিজী বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া ঝটিতি উত্তর করিতেন,—'ইয়ে কায়স্থ শরীর হ্যায়।' আবার খানিক পরেই হয় ত আর একজন জিজ্ঞাসা করিল,—'মহারাজ, আপ গেরুয়া, পিহন্‌তে হ্যায় কেঁও?' (মহারাজ আপনি গেরুয়া পরেন কেন?) স্বামিজী উত্তর দিতেন,—'ইয়ে ফকীরকে ভেক হ্যায়, সফেদ কাপড়া পিহন্‌নেসে গরীব লোগ হম্‌সে ভিক মাঙ্গতে হ্যায়। লেকিন ম্যয় ত ফকির হুঁ। ভিক কাঁহাসে দিউ? উস্ লিয়ে ম্যয় আপ্ গরীবোঁকা ভেষ বনায়া, যৈসে গরীবোঁ হম্‌সে তফাৎ যায়, ইয়ে সমঝ্‌কে কি যো খুদ আপহি মাঙ্গনেওয়ালা হায় উসে মাঙ্গনেকা কিয়া ফয়েদা?' (সাদা কাপড় পরে থাকলে অনেক দরিদ্র লোক ভিক্ষা চায়। নিজে ভিক্ষুক, অনেক সময় কাছে এক পয়সাও থাকে না যে তাদের দিই। আবার চাইলে না দিতে পারলে কষ্ট হয়। গেরুয়া পরা দেখলে তারা বোঝে এও আমাদের একজন, এর কাছে আবার কি চাইব?) পরক্ষণেই আবার পূর্ব্ববৎ তত্ত্বপ্রবাহ চলিতে থাকিত। তাহা হইতে ক্রমে হয় ত শক্তি উপাসনার কথা উঠিল। জগজ্জননীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ এরূপ নাচিয়া উঠিত যে মুখে আর অন্য কথা নাই, শুধু মা মা ধ্বনি। প্রথমে উচ্চকণ্ঠে, পরে ধীরে ধীরে, ক্রমশঃ

অতি অস্ফুটস্বরে সে ধ্বনি বাহ্ ছাড়িয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে মিলাইয়া যাইত; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্থির হইয়া উঠিত এবং আরক্তিম আয়ত-লোচনদ্বয় হইতে প্রবলবেগে প্রেমাশ্রু ছুটিত। শ্রোতৃবৃন্দ সে ভাবদর্শনে চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিতেন ও অবিশ্রান্ত নয়নজলে ভাসিতেন। তারপর স্বামিজী আবার গান ধরিতেন। তাঁহার মধুর কণ্ঠের সহিত নয়নের স্নিগ্ধবারি মিলিত হইয়া সকলের প্রাণে ভগবৎপ্রেমের প্রস্রবণ মুক্ত করিয়া দিত। আবার কখন কখন দার্শনিক প্রসঙ্গ ও তত্ত্বকথা ছাড়িয়া নানা দেশের ও জাতির নানাবিধ রীতিনীতির কথায় হাসির হিল্লোল তুলিয়া অপূর্ব্ব উপদেশ দিতেন। দ্বিপ্রহরের সময় গৃহস্বামী পণ্ডিতজী তাঁহাকে আহারে আহ্বান করিলে তিনি বিদায় লইয়া ভোজনে গমন করিতেন, তাঁহারাও সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতেন। ভোজনান্তে আবার বাহিরে আসিয়া দেখিতেন, হয়ত নিকটস্থ পল্লীর লোকেরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে পুনরায় পূর্ব্বের মত জনতা হইত এবং সেই প্রাণস্পর্শী কথার প্রস্রবণ ছুটিত।

বৈকালে তিনি যখন ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখনও অন্ততঃ দশ বার জন লোক তাঁহার সঙ্গে থাকিত। সন্ধ্যার পরে দৈনিক কার্য্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আরও অধিক লোক আসিয়া জুটিত। স্বামিজী সে সময়ে গান আরম্ভ করিতেন ও সকলকে তাঁহার সহিত সুর মিলাইয়া গাহিতে বলিতেন। হয়ত একটা বাঙ্গালা কীর্ত্তন ধরা হইল, দুই চারিদিন চেষ্টার পর অনেকেই তাঁহার সহিত সমস্বরে বেশ বাঙ্গালা কীর্ত্তন গাহিতে পারিতেন। মধ্যে মধ্যে নৃত্যও হইত। রাজপুতানা বৈষ্ণব-প্রধান স্থান, কৃষ্ণবিষয়ক গান সকলের অত্যন্ত ভাল লাগে, তাই স্বামিজী একদিন গাহিলেন—

(আমি) গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিয়ে শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যথায় নিঠুর হরি॥
(আমি) মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হ'য়ে।
যদি কোন ঘরে মিলে প্রাণবঁধু
বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে॥
আমি আপন বঁধুয়া আপনি বাঁধিব—
রাখিতে নারিবে কেউরে।
যদি রাখে কেউ ত্যজিব এ জীউ
নারীবধ দিব তারে॥

গাহিতে গাহিতে তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সকলের চক্ষে জল—দৃষ্টি সেই মহাপুরুষের প্রতি। কেহ ভাবিতেছেন,—"বাবাজী নিশ্চয় বৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শন পাইয়াছেন, তাই এত প্রেমবিভোর। নতুবা আমরাও ত তাঁহাকে ডাকি, কিন্তু কৈ, আমাদের ত এমন তন্ময়তা হয় না।" কেহবা ভাবিতেছেন,—'এইটুকু ঈশ্বরের বিভূতি, ইনি নিশ্চয় ঈশ্বরলাভ করিয়াছেন।' গাহিতে গাহিতে স্বামিজীর স্বর ক্রমে করুণ হইতে করুণতর হইয়া আসিল, হৃদয়ের আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ ও দেহ প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া গেল এবং মুখশ্রী প্রাণবঁধুর স্পর্শে উৎফুল্ল গোপিকার ন্যায় প্রেমরাগে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব আভা ধারণ করিল।

স্বামিজী যে সকল বাঙ্গালা গান গাহিতেন, শ্রোতৃবৃন্দের সুবিধার জন্য গাহিবার পূর্ব্বে সেগুলি হিন্দীতে বুঝাইয়া দিতেন। অনেকে সেগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন, কেহ বা ভুলিয়া যাইবার ভয়ে লিখিয়া রাখিতেন।

এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। কয়দিন গেল কেহ তাহার হিসাবও রাখিল না—খেয়ালও করিল না। সকলেই তখন আত্মহারা। এক এক দিন রাত্রি চারটা পর্য্যন্ত এইরূপ আনন্দ চলিত। আর রাত্রের মত বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিবার সময় সকলেরই মুখে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা। কেহ বলিতেছেন,—'বাবাজীর হৃদয় আনন্দে ভরপূর, মুখে হাসি লেগেই আছে।' কেহ কহিতেছেন,—'মশায়, এমন সুন্দর শ্লোকপাঠ আর কাহারও মুখে শুনি নি, কণ্ঠে যেন রূপার তার বাজে।' কেহ বলিলেন,—'হাঁ, তাঁর কণ্ঠে নাদ আছে।' আর একজন তাহা শুনিয়া বলিলেন,—'শুধু তাই নয়, এমন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আছে যে শুনিলেই মুগ্ধ হইতে হয়।' কেহ বা বলিল,—'আর দেখেছেন, প্রকৃতিটি কি মধুর! এত লোক এত বিরক্ত করে, আহাম্মোকের মত যা' তা' জিজ্ঞাসা করে, তা রাগ নেই, সব কথার জবাব দিচ্ছেন।' তদুত্তরে আর একজন কহিলেন,—'রাগ টাগ নেই, সিদ্ধপুরুষ—নইলে দেখুন না কেবল মনে হয় কতক্ষণে তাঁর কাছে যাব? ইচ্ছা হয় দিনরাত তাঁর নিকট বসে থাকি।' ইত্যাদি—

ফলতঃ ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই তাঁর ভক্ত হইয়া উঠিল, প্রত্যেকে মনে করিত সেই সর্ব্বাপেক্ষা স্বামিজীর অধিকতর প্রিয়। কিন্তু স্বামিজীর নিকট কোন ভেদ ছিল না, বরং গরীবের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসা আরও অধিক দেখা যাইত। তিনি তাঁহাদিগকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন এবং কাহাকে কাহাকে ইষ্টলাভের পথ দেখাইবার জন্য দীক্ষাও দিয়াছিলেন।

ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত মৌলবী সাহেব তাঁহার একজন প্রধান ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মনে একদিন স্বামিজীকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করাইবার অতি প্রবল ইচ্ছা হইল। ভাবিলেন,

"স্বামিজী ত একজন শ্রেষ্ঠ ফকির, তাঁহার নিকট জাতিভেদ নাই, কিন্তু পণ্ডিতজী (অর্থাৎ শম্ভুনাথজী) হয়ত আপত্তি করিতে পারেন!" যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে একদিন সন্ধ্যার সময় অন্যান্য দিনের মত স্বামিজীকে দর্শন করিতে গিয়া সকলের সাক্ষাতে করযোড়ে বৃদ্ধ পণ্ডিতজীকে বলিলেন, 'পণ্ডিতজী, আপনারা অনুমতি করিলে আমি কাল বাবাজীকে আমার কুটীরে লইয়া গিয়া ভিক্ষা দিই। তাহার জন্য এমন বন্দোবস্ত করিব যে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না। বৈঠকখানার সব জিনিষপত্র সরাইয়া ঘরটি উত্তমরূপে ধোয়াইব। তারপর ব্রাহ্মণের বাটী হইত পিতলের হাঁড়িবাসন ইত্যাদি আনাইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা বাজার ও রসুই করাইব। স্বামিজী ঐ গৃহে বসিয়া সেবা গ্রহণ করিবেন, আর এ অধম যবন শুধু দূর হইতে তাঁহাকে ভোজন করিতে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।' মৌলবী সাহেব এরূপ আন্তরিক বিনয় ও সৌজন্যের সহিত কথাগুলি বলিলেন যে, তাঁহার অকপটতায় কাহারও সন্দেহ হইল না। পণ্ডিতজী হাসিয়া সাদরে তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, 'দোস্ত্, স্বামিজীর আবার জাতি কি? তিনি ত মুক্তপুরুষ! তবে তোমার যেরূপ অভিরুচি করিতে পার। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার এত কষ্ট করারও কোন দরকার ছিল না, কারণ তুমি যেরূপ ব্যবস্থার কথা বলিলে তাহাতে স্বামিজীর কথা ছাড়িয়া দাও, আমিই নির্ব্বিকারচিত্তে তোমার গৃহে ভোজন করিতে পারি।' সকলেই হাসিয়া মৌলবী সাহেবকে লইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন ও তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তি ও দীনতার সুখ্যাতি করিলেন। পরদিন মৌলবী সাহেবের অভিলাষ পূর্ণ হইল। স্বামিজী তাঁহার গৃহে আহার করিলেন। মৌলবী সাহেবের সাধুসেবা দেখিয়া আরও কয়েকজন ভক্ত মুসলমানবন্ধু অতিশয় আগ্রহের

সহিত স্বামিজীকে নিজ নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন।

ক্রমে ক্রমে আলোয়ার মহারাজের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী শুনিতে পাইলেন যে, নগর মধ্যে একজন মস্ত সাধু আসিয়া বাস করিতেছেন। শ্রবণমাত্র তিনি স্বামিজীকে অতি সমাদরে নিজালয়ে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামিজীর প্রভাবে আলোয়ার-রাজের ইংরাজী-ভাবাপন্ন মতিগতির পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। এই ভাবিয়া তিনি মহারাজকে সংবাদ দিলেন, 'একজন সাধু এখানে আসিয়াছেন। তিনি ইংরাজীতে প্রকাণ্ড পণ্ডিত।' মহারাজ তখন ঐ স্থান হইতে দুই তিন মাইল দূরে একটি নিভৃত প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। দেওয়ানজীর পত্র পাইয়া তিনি পরদিন নগরে আগমন করিলেন ও একেবারে দেওয়ানজীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া স্বামিজীকে দর্শন ও শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম করিয়া সাদরে তাঁহাকে নিজ সম্মুখে উপবেশন করাইলেন।

মহারাজের প্রথম কথা হইল—"আচ্ছা স্বামিজী মহারাজ, শুন্‌ছি আপনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তা আপনি ত সহজেই অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। তাহা না করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন?" স্বামিজী উত্তর করিলেন,—'মহারাজ, আপনি বলিতে পারেন যে আপনি রাজকার্য্য অবহেলা করিয়া দিনরাত্রি সাহেবদের সঙ্গে খানা খাইয়া শিকার করিয়া বেড়ান কেন?' সভাসদ্‌গণ ত স্বামিজীর কথার ভঙ্গীতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'একি দুঃসাহসিক সাধু! হয়ত এঁর কপালে আজ কি আছে।' কিন্তু মহারাজ স্বামিজীর কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, 'কেন আমি ঐরূপ করি বলিতে পারি না, তবে হ্যাঁ,

ঐরূপ করিতে ভাল লাগে।' স্বামিজী সহর্ষে বলিলেন, 'বেশ, আমারও সেই রকম, ফকিরী ক'রে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে।'

মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা বাবাজী মহারাজ, এই যে সকলে মূর্ত্তি পূজা করে, আমার ওতে মোটেই বিশ্বাস নেই, তা আমার দশা কি হবে?' বোধ হয় একটু বিদ্রূপের ছলে বলিয়াছিলেন বলিয়া কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ ঈষৎ হাস্য করিলেন। স্বামিজী প্রথমে যেন কথাটা প্রত্যয় হইতেছে না এই ভাবে বলিলেন, 'মহারাজ বোধ হয় রহস্য করিতেছেন।' মহারাজ বলিলেন, 'না স্বামিজী, মোটেই নয়। দেখুন বাস্তবিকই আমি অন্যলোকের মত কাঠ, মাটি, পাথর, ধাতু এ সকল পূজা করিতে পারি না। এতে কি পর-জন্মে আমার নীচগতি হবে?' স্বামিজী বিশেষ কিছু না বলিয়া শুধু বলিলেন, 'যাহার যেমন বিশ্বাস।' এই কথা শুনিয়া স্বামিজীর ভক্তেরা ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'একি হইল? স্বামিজী মহারাজের কথায় শেষে এই জবাব দিলেন! এতে ত উঁহার শ্রদ্ধাহীনতার আরও প্রশ্রয় দেওয়া হইল। আর কি বলিয়া তিনি এরূপ মনরাখা কথা বলিলেন? এ ত তাঁর নিজের ভাব নয়।' তাঁহারা সকলেই মূর্ত্তিপূজায় দৃঢ়বিশ্বাসী এবং কৃষ্ণভক্ত। স্বামিজীর কৃষ্ণভক্তি তাঁহারা অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং এক এক দিন তাঁহাকে শ্রীবিহারীজীর সমক্ষে প্রেমে গদগদ হইয়া গড়াগড়ি দিতে ও অশ্রুজলে ভাসিতেও দেখিয়া-ছেন। সুতরাং এক্ষণে স্বামিজীর কথায় তাঁহাদের হৃদয়ে সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

ঠিক সেই সময়ে স্বামিজী তাঁহার অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও নির্ভীকতায় সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।

সম্মুখের দেওয়ালে আলোয়ার-মহারাজের একখানা ফটোগ্রাফ

টাঙ্গান ছিল। হঠাৎ তাহার উপর নজর পড়ায় স্বামিজী একজনকে তাহা নামাইয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সে ব্যক্তি তাহা নামাইয়া আনিলে তিনি ছবিখানি স্বহস্তে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ কার ছবি?' দেওয়ানজী উত্তর করিলেন,—'মহারাজের'। সকলে বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, স্বামিজীর মতলব কি। কিন্তু কেহই কিছু ঠাহর করিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তকাল পরে যখন স্বামিজী গম্ভীরস্বরে দেওয়ানজীকে আদেশ করিলেন, 'দেওয়ানজী, এই চিত্রের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ কর', তখন সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। মহারাজের সম্মুখে এ কি স্পর্দ্ধার কথা! স্বামিজী পুনরায় সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'তোমাদের মধ্যে যে কেউ হোক্ এই ছবির উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ কর।' কেহই অগ্রসর হইল না দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'এ কি? এ ত একখানা কাগজ মাত্র! ইহাতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে তোমাদের কি এত আপত্তি?' দেওয়ানজীও বজ্রাহতপ্রায়, আর সকলে ভয়ে জড়সড়—একবার মহারাজের দিকে, একবার স্বামিজীর দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। কাহারও মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইতেছে না। দেওয়ানজী ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন, 'স্বামিজী, আপনি এ কি আদেশ করিতেছেন? ইহা আমাদের মহারাজের প্রতিকৃতি—ইহার প্রতি আমরা কিরূপে অসম্মান প্রদর্শন করিতে পারি?' স্বামিজী বলিলেন, 'কেন, মহারাজ ত আর সশরীরে ঐ চিত্রে বিদ্যমান নাই! উহাতে না আছে তাঁহার হাড় মাস রক্ত, না আছে তাঁর কথাবার্ত্তা, না আছে তাঁর চালচলন। উহা তো একখণ্ড কাগজমাত্র, ইহা সত্ত্বেও তোমরা উহার উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে এত ভয় বা সঙ্কোচ বোধ করিতেছ কেন?' কিন্তু তথাপি কেহ কোন উত্তর দিল না বা তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিল না। অবশেষে

তিনি নিজেই বলিলেন, 'ভয় কেন? না, এই ফটোতে তোমরা মহারাজের ঐ সাদৃশ্যটুকু, ঐ ছায়াটুকু দেখিতে পাইতেছ। উহার উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে গেলেই তোমাদের অনুভব হইতেছে যেন স্বয়ং মহারাজেরই গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা হইতেছে।' এতক্ষণ পরে দেওয়ানজী ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ তাই বটে।' স্বামিজী তখন মহারাজের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, দেখুন—যদিও এই চিত্রটি আপনি নহেন, একটুকরা কাগজ মাত্র, তথাপি ইঁহারা উহাকে ঠিক আপনার মতই ভাবেন, কারণ উহাতে আপনার প্রতিবিম্ব বিদ্যমান। সুতরাং এক হিসাবে ঐ চিত্রের সহিত আপনার কোন প্রভেদ নাই। উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আপনার স্মৃতি ইঁহাদের চিত্রপটে জাগিয়া উঠে—অনুভব হয় যেন আপনি স্বয়ং সম্মুখে বিদ্যমান। সেই হেতু সকলেই প্রকৃত মহারাজকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, এই চিত্রকেও সেইরূপ সম্মানের চক্ষে দেখেন। ভগবদ্ভক্তও প্রস্তর বা ধাতুনির্ম্মিত দেবদেবী মূর্ত্তিকে এই ভাবে দেখেন। তাঁহারা প্রস্তর বা ধাতুবোধে ঐ সকল মূর্ত্তির উপাসনা করেন না, উহার মধ্যে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের কোন লীলার ভাব প্রত্যক্ষ করেন। মূর্ত্তিটী শুধু মনে আরাধ্য দেবতার স্মৃতি ফুটাইয়া তুলে বা তাঁহার কোন গুণকে স্মরণ করাইয়া ভাবের উদ্দীপন করে। ইহাই প্রকৃত প্রতীকোপাসনা তত্ত্ব। আমি বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু কুত্রাপি দেখি নাই মূর্ত্তিপূজক বলিতেছে, 'হে প্রস্তর, আমি তোমার উপাসনা করি। হে ধাতু, আমার প্রতি সদয় হও।' মহারাজ, সকলেই সেই এক পূর্ণ পরব্রহ্মসত্তার উপাসনা করিয়া থাকে এবং তিনিও ভক্তের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তাহার নিকট আত্মস্বরূপ ব্যক্ত করেন। পাষাণ বা ধাতু মূর্ত্তি দেখিলে সেই চিন্ময়

ইষ্টকেই মনে পড়ে, তাই ভক্ত ঐ মূর্ত্তির এত সম্মান করেন। মহারাজ, আমি ত এই ভাবে দেখি, অপরের কথা বলিতে পারি না।”

মহারাজ মঙ্গলসিংহ এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে স্বামিজীর বচন শ্রবণ করিতেছিলেন। স্বামিজীর কথা শেষ হইলে তিনি করযোড়ে নিবেদন করিলেন, “প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, তাহার প্রতি বর্ণ সত্য। আমি এত দিন অন্ধ ছিলাম, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আজি আমার চক্ষু খুলিল।” স্বামিজী গাত্রোত্থান করিলে মঙ্গলসিংহজী বলিলেন, ‘মহারাজ, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।’ উত্তরে স্বামিজী বলিলেন, “রাজন্! পরমাত্মা ব্যতীত কেহ কাহাকেও অনুগ্রহ করিতে পারে না। তিনি অসীম করুণাসিন্ধু। আপনি তাঁহার শরণাগত হউন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে কৃপা করিবেন।”

স্বামিজী প্রস্থান করিলে পর মহারাজ কিয়ৎক্ষণ চিন্তামগ্নভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া কহিলেন, “দেওয়ানজি! এরূপ মহাত্মা আর কখনও আমার নয়নগোচর হয়েন নাই। ইঁহাকে কিছুদিন এখানে রাখিতে পারেন না?” দেওয়ানজী সাধ্যমত মহারাজের আদেশ পালনের অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন, “বলিতে পারি না মহারাজ! কারণ ইনি অতি তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি। হয়ত এখানে থাকিতে ইচ্ছুক হইবেন না। তবে আমি যেরূপে পারি ইঁহার সন্ধান রাখিব।” দেওয়ানজী মহারাজের অভিপ্রায় স্বামিজীর গোচর করিলে ও আলোয়ারে কিয়দ্দিন যাপন করিবার জন্য তাঁহাকে সবিশেষ অনুরোধ করিলে স্বামিজী দেওয়ানজীর প্রস্তাবমত তাঁহার আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন—কিন্তু এই সর্ত্তে যে, ধনী দরিদ্র মূর্খ বা পণ্ডিত নির্ব্বিশেষে যে সকল শ্রেণীর লোক এখন তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছে, পরেও তাঁহারা তেমনি স্বাধীনভাবে তাঁহার নিকট যাতায়াত

করিতে পারিবে। দেওয়ানজী সাহ্লাদে স্বামিজীর ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলে স্বামিজী তাঁহার আলয়ে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করিলেন।

এই সময়ে স্বামিজীর সংস্পর্শে বহুব্যক্তির জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে এত ভালবাসিতে লাগিলেন যে, তিনি স্থানান্তরে যাইবার প্রস্তাব করিলেই তাঁহাদের মুখ শুখাইয়া যাইত, বলিতেন, 'মহারাজ, দয়া করিয়া আরও কিছুদিন থাকুন, আপনাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয় না।' স্বামিজীর হৃদয় পুষ্প হইতেও কোমল, সুতরাং একমাসের মধ্যে তাঁহার যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

একজন বৃদ্ধ প্রত্যহ তাঁহার নিকট আসিয়া আশীর্ব্বাদ ও দয়া ভিক্ষা করিত। স্বামিজীও তাহাকে কতকগুলি উপদেশ দিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি উপদেশানুযায়ী কার্য্য না করিয়া কেবল বলিত—"আমায় কৃপা করুন, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন" ইত্যাদি। বহুদিন ধরিয়া প্রত্যহ ঐরূপ করাতে স্বামিজী আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। একদিন দূর হইতে সেই ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ মানসে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন। বৃদ্ধ আসিয়া পূর্ব্ববৎ প্যান্ প্যান্ করিতে লাগিল ও দু'শ রকম কথা পাড়িল। কিন্তু স্বামিজী নির্ব্বাক্, নিশ্চল, এমন কি পূর্ব্ব হইতেই যাহাদিগের সহিত খুব আলাপ করিতেছিলেন, তাহাদিগেরও কথার উত্তর দেওয়া বন্ধ করিলেন। কেহ তাঁহার এইরূপ আকস্মিক ভাবপরিবর্ত্তনের কোন কারণ অনুমান করিতে পারিলেন না। এই ভাবে দেড়ঘণ্টা কাটিয়া গেল, অথচ স্বামিজী প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত পড়িল না। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি অবশেষে অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া

আপনমনে বকিতে বকিতে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। স্বামিজী তখন বালকের ন্যায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন ও উপস্থিত সকলে তাঁহার হাস্যে যোগদান করিল। এই ব্যাপার দর্শনে একজন যুবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবাজী মহারাজ, আপনি বৃদ্ধের উপর আজ এত বিরূপ হইলেন কেন?' স্বামিজী সস্নেহ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'বাবা, তোমাদের ন্যায় যুবকগণের জন্য আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নহি, কারণ তোমরা বালক, আমি যাহা বলিব তাঁহা প্রাণপণে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে এবং ঐরূপ করিবার শক্তিও তোমাদের আছে। কিন্তু এই বৃদ্ধটি জীবনের তিনকাল ইন্দ্রিয়সেবায় কাটাইয়া এক্ষণে ঐহিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ পথের পক্ষে অক্ষম ও অপটু হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং উনি এখন সস্তায় ফাঁকি দিয়া ঈশ্বরের দয়া খুঁজিতেছেন, যদি তাহাতে কার্য্য সারিতে পারেন। পুরুষকার একেবারেই নাই। কিন্তু পুরুষকার-বর্জ্জিত ব্যক্তির প্রতি কি ঈশ্বরের দয়া হয়? বুঝিয়া দেখ অর্জ্জুনের ন্যায় মহাবীর কুরুক্ষেত্রে পুরুষকার হারাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে গীতার উপদেশ দিয়া তাঁহার পুরুষার্থ জাগাইলেন, কর্ম্ম, স্বধর্ম্ম সব করাইলেন। যাহার পুরুষার্থ নাই, সে ত তমোগুণে আচ্ছন্ন। তমোগুণীর কি ধর্ম্ম হয়? তাহাকে পুরুষার্থ অবলম্বন করিয়া রজোগুণী হইতে হইবে। স্বধর্ম্মপালন, নিষ্কাম কর্ম্মসাধন প্রভৃতি দ্বারা সত্ত্বগুণ লাভ করিতে হইবে—তবে ধর্ম্মলাভ। যে গৃহী স্বধর্ম্মই করিতে পারে না, কোন প্রকার নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তার নিবৃত্তি আসিবে কেমন করিয়া? উনি চান নিবৃত্তি, অথচ প্রবৃত্তির কোন কার্য্যই অনুষ্ঠান করিবেন না—মহা তমোগুণী। চোর হইয়া যে চুরি করিতে পারে, আমার মতে এমন দৃঢ়চেতা দুষ্ট লোকও ভাল, কারণ

তাহার পুরুষকার আছে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আছে, একদিন ঐ দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতাই তাহাকে হয়ত কুপথ হইতে সুপথে ফিরাইয়া আনিবে এবং অসত্যের স্থলে সত্য ও প্রবৃত্তির স্থলে নিবৃত্তিকে তাহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবে, কিন্তু দুর্ব্বল লোকের দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না—তাহার উদ্দেশ্য যতই সাধু হউক ও সে যতই সৎসঙ্গ করুক।”

স্বামিজীর উপদেশানুসারে আলোয়ারের অনেকগুলি যুবক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। সময়ে সময়ে স্বামিজী স্বয়ং ঐ শিক্ষা দিতেন ও বলিতেন, “সংস্কৃত বিদ্যার প্রভূত চর্চ্চা কর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা আমাদের জাতীয় ইতিহাসটাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কর। কারণ বর্ত্তমানে এদেশের ইতিহাস অতিশয় অসম্পূর্ণ ও ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য-রক্ষণ বিষয়ে উদাসীন। আর ইংরাজ লেখকগণ এদেশের যে সকল ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অধঃপতনের চিত্রগুলিই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, উহা পাঠ করিলে হৃদয়ে দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। তাঁহারা বিদেশীয়, এদেশের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম, দর্শন, সামাজিক রীতি-নীতি সর্ব্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের দ্বারা এদেশের নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হওয়া কখনই সম্ভব নহে, সুতরাং তাঁহাদের রচনার মধ্যে যে শত শত ভ্রমপ্রমাদ ও অপসিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তবে ইউরোপীয়েরা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, কি করিয়া পুরাতত্ত্ব আলোচনা ও প্রাচীন ইতিবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে হয়। এখন আমাদিগের এই সকল পথে স্বাধীনভাবে বিচরণ করা উচিত ও প্রয়োজন। বেদ-পুরাণাদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ ও তৎসাহায্যে ভারতের একটী যথার্থ

ইতিহাস সঙ্কলন কর। শিবাজীর জীবন অনুসন্ধান কর, দেখিবে তিনি একজন জাতি-প্রতিষ্ঠাতা মহা-শক্তিশালী পুরুষ—ইংরাজ ঐতিহাসিক-চিত্রিত দস্যু নহেন, প্রকৃতপক্ষে বৈদিক কাল হইতে বুদ্ধান্তর্ধানের পর এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। অবশ্য এখন এ বিষয়ে একটা নবযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু ভারতের ইতিহাস ভারতসন্তান কর্ত্তৃক গ্রথিত হওয়াই উচিত। তোমরা বিস্মৃতিসাগর হইতে এই লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হও। উহাই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিবে ও উহার ক্রমোন্নতির সহিত দেশে প্রকৃত স্বদেশানুরাগ জাগ্রত হইবে।”

আলোয়ারবাসী যুবকগণ স্বামিজীর বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদের কল্যাণের জন্য নিয়ত প্রার্থনা করিতেন ও তাহাদের উপর খুব ভরসা রাখিতেন। তাঁহার অগ্নিময়ী বাণী তাহাদের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগবহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল ও তাহারা তাঁহাকে আপনাদিগের নেতা ও গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল।

একদিন স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘নিকটে কোন সাধু আছেন কি না।’ তদুত্তরে একজন বলিল, ‘কিছুদূরে একজন বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী আছেন।’ স্বামিজী বলিলেন, ‘আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল ও তাঁহার সহিত দর্শন করাইয়া দাও।’ তখন দুইজনে সেই ব্রহ্মচারীর আশ্রমে গমন করিলেন। ব্রহ্মচারীজি বোধ হয় ছিলেন—বৈষ্ণব ও বৈদান্তিক সাধুদিগের উপর বিশেষ কোপযুক্ত, কারণ, দূর হইতে স্বামিজীকে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি গেরুয়ার শত সহস্র নিন্দা ও সন্ন্যাসীদিগের উপর অযথা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে বলিলেন,—‘তুই গেরুয়া পরেছিস কেন? আমি গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীদের দুচক্ষে

দেখতে পারি না।' স্বামিজী কোন বাদপ্রতিবাদ না করিয়া বিনীত-ভাবে তাঁহার নিকট ঈশ্বর ও ধর্ম্মবিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে ব্রহ্মচারী ঈষৎ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—'আচ্ছা থাক্, তোর ওপর আমার তেমন রাগ নেই, তুই কিছু খাবি?' স্বামিজী করযোড়ে বলিলেন, 'আজ্ঞে এইমাত্র ভিক্ষা করে আসছি, এখন আর কিছু আহারের আবশ্যক নেই। আপনি অনুগ্রহ ক'রে কিছু তত্ত্বকথা বলুন আমি শুনি।' আর কোথায় যাবি! ব্রহ্মচারী এ কথা শুনিবামাত্র পুনরায় বিষম ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'তবে যা দূর হ, কিছু খাবিনি ত দূর হ।' স্বামিজী তদনুসারে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে সাধুদর্শন করাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি স্বামিজীর এরূপ অবমাননায় অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ভীত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন, স্বামিজী হয়ত তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। এই ব্যাপারে অসন্তোষের পরিবর্ত্তে তাঁহার এত আমোদ বোধ হইয়াছিল যে, যতক্ষণ ব্রহ্মচারীর নিকটে ছিলেন, ততক্ষণ অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু রাস্তায় আসিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, এমন হাসিয়া উঠিলেন যে তাঁহার সহচরটী পর্য্যন্ত না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। তারপর বলিলেন,—'আচ্ছা সাধু দেখালে বাবা, কি তিরিক্ষে মেজাজের লোক, আর কি গালাগালির চোট রে বাবা!' এই বলিয়া পুনরায় হাস্য করিতে লাগিলেন এবং সেই ব্রহ্মচারীর মত নকল করিয়া আপনি হাসিতে ও সঙ্গীটিকে ততোধিক হাসাইতে লাগিলেন।

স্বামিজীর গুণাবলী, চরিত্র-মহিমা ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা সকলকেই মুগ্ধ করিল। যে সকল লোক প্রতিদিন তাঁহার নিকট আসিতেন, তাঁহাদের কেহ একদিন অনুপস্থিত হইলে তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন

ও কাহারও দ্বারা তাহার সংবাদ আনাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। একদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালক আসিয়া উপস্থিত, তাহার উপনয়নের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, অথচ উপনয়ন হয় নাই। অনুসন্ধানে জানিলেন পেটের অন্নই জুটে না, তা আবার উপনয়ন-সংস্কার! স্বামিজীর আর অন্য চিন্তা নাই। যিনি তাহার নিকট আসেন, তাঁহাকেই বলেন,—'আমার এক ভিক্ষা আছে—অর্থাভাবে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালকটীর উপনয়ন হইতেছে না, তোমাদের ন্যায় গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে উহাকে সাহায্য করা। কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উহার ঐ কার্য্যটী উদ্ধার করিয়া দাও ও সঙ্গে সঙ্গে যদি পার উহার শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা কর। এত বড় ব্রাহ্মণ-বালকের পক্ষে বর্ণাশ্রমোচিত সংস্কারবিহীন হইয়া থাকা বড় নিন্দার কথা।' তাঁহার অনুরোধে ভক্তেরা আপনাদিগের মধ্যে চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তিনি শীঘ্রই ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করায় স্বচক্ষে উক্ত ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন-কার্য্য দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তবে তাহার কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই, তাহার প্রমাণ এই যে মাসখানেক পরে আলোয়ারের এক বন্ধুকে তিনি যে পত্র লেখেন, তাহার আরম্ভেই ঐ বালকের উপনয়ন সমাধা হইয়াছে কিনা তাহার খোঁজ করিয়াছিলেন।

এইভাবে প্রায় দুইমাস অতীত হইলে স্বামিজী বলিলেন,—'আর এখানে থাকা যায় না।' ইহা শুনিয়া তাঁহার জনৈক মন্ত্রশিষ্য তাঁহাকে আপন আলয়ে ভিক্ষা করিবার নিমন্ত্রণ করিলেন, স্বামিজী যখন তাঁহার বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলেন, শিষ্য তখন স্নান করিতেছিলেন। স্বামিজী উপবিষ্ট হইলে শিষ্য প্রশ্ন করিলেন,—'বাবাজি, তেল মাথার কি কোন উপকার আছে?'

স্বামিজী কহিলেন, "আছে বৈকি। এক ছটাক তেল ভাল ক'রে মাখ্‌লে একপোয়া ঘি খাওয়ার কাজ করে।"

আহারাদির পর নানা কথা প্রসঙ্গে শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, "স্বামিজী মহারাজ, আপনি বলেন, চরিত্রের দিকে আমাদের বিশেষ নজর রাখা চাই—সত্যনিষ্ঠ, অকপট, পরোপকারী, কর্ম্মঠ, আর অসীম সাহসী হওয়া চাই; এ সব না থাকলে গৃহস্থ স্বধর্ম্ম কর্‌তে পারে না, চিত্তশুদ্ধি হয় না—কিন্তু চাকরী করা ত দাসত্ব, তাতে এ সব ভাব আসে না দেখছি—তাই ভাবি, আমাদের ত অর্থোপার্জ্জন করতে হবে, নইলে নিষ্কাম কার্য্যের অনুষ্ঠান কেমন ক'রে ক'রব? আজকালকার ব্যবসা যে রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে ত অনেক ম্যাচকাফের আছে। আমার মনে হয়, এতে অনেক অর্থের আবশ্যক, তারপর সরলতা থাকে না। তা মহারাজ, কোন্ কাজ কর্‌লে সব দিক বজায় থাকে?"

স্বামিজী উত্তর করিলেন,—"দেখ এ বিষয়ে আমিও অনেক ভেবেছি, কিন্তু দেখ্‌তে পাই চরিত্র বজায় রেখে অর্থ উপার্জ্জন কর্ত্তে কেউ বড় চায় না, এ বিষয়টা নিয়ে কেউ ভাবে না, কারুর মনে একটা সমস্যা ওঠে না। আমাদের শিক্ষার দোষেই এটা দাঁড়িয়েছে; যা হোক আমিত ভেবে চিন্তে চাষবাস করাটা বড়ই ভাল মনে করেছি। চাষবাসের কথা বল্লেই এখন মনে হয় তবে লেখাপড়া কেন শিখলাম? চাষবাসের কথা বল্লেই প্রথমে মনে হয় দেশশুদ্ধ লোককে কি আবার চাষা হয়ে দাঁড়াতে হবে? দেশশুদ্ধ লোক ত চাষা আছেই, তাই না আমাদের এত দুর্গতি। তা নয়, মহাভারত পড়ে দেখ—জনক ঋষি এক হাতে লাঙ্গল দিচ্ছেন আর এক হাতে বেদ অধ্যয়ন করছেন। আমাদের দেশের ঋষিরা সকলেই ঐ কাজ করেছেন, আবার আজকাল

দেখ, আমেরিকা চাষবাস করেই এত বড় হয়েছে। নেহাত চাষাড়ে বুদ্ধিতে চাষবাস নয়, বিদ্বান্ বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে করতে হবে। পল্লী-গ্রামের ছেলেরা দুপাতা ইংরাজী প'ড়ে সহরে পালিয়ে আসে, গ্রামে হয়ত অনেক জায়গা জমী আছে, তাতে তাঁদের পেট ভরে না—মনের তৃপ্তি হয় না। সহুরে হ'তে হবে, চাকরী করতে হবে, অন্যান্য জাতের মত আমাদের হিন্দু জাতটা তাই বেড়ে উঠ্তে পারছে না! আমাদের মৃত্যুসংখ্যা এত বেশী যে, যদি এরকম ভাবে জন্ম-মৃত্যু চল্তে থাকে, তাহ'লেত আমরা মর্তে বসেছি। এর একটা কারণ, উৎপন্ন ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না। সহরে বাস করার ঝোঁক বেশী, আর একটু পড়া শুনো কল্লেই চাষার ছেলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে গোরার গোলামী কর্ত্তে দৌড়ায়। পল্লীগ্রামে বাস করলে পরমায়ু বাড়ে, রোগ ত প্রায় হয় না। ছোটখাটো খারাপ গ্রামগুলো ভাল হয়ে উঠে, লেখাপড়া জানা লোকে পল্লীগ্রামে বাস কল্লে, আর চাষ-বাসটা বিজ্ঞান সাহায্যে কল্লে উৎপন্ন বেশী হয়—চাষাদের চোখ খুলে যায়, তাদেরও একটু আধটু বুদ্ধি খোলে, লেখা পড়া কর্তে ইচ্ছে হয়, আর যেটা আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আবশ্যক তাও হয়।"

শিষ্য আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সেটা কি স্বামিজী?"

স্বামিজী আবার বলিতে লাগিলেন,—"এই ছোট জাতে আর বড় জাতের মধ্যে একটা ভাই ভাই ভাবে মেশামিশি হয়। যদি তোমাদের মত লোকেরা কিছু লেখা পড়া শিখে পল্লীগ্রামে থেকে চাষ-বাস করে, আর চাষা লোকদের সঙ্গে আপনার মত ব্যবহার করে, ঘৃণা না করে, তাহ'লে দেখবে তারা এতই বশীভূত হয়ে পড়বে যে, তোমার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হবে। যেটা আমাদের এখন অত্যাবশ্যক—জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া—ছোট জাতের মধ্যে ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ ভাব দেওয়া, পরস্পর

সহানুভূতি ভালবাসা উপকার করতে শেখান, তাহাও অতি অল্প আয়াসেই আয়ত্ত হবে।”

শিষ্য আবার প্রশ্ন করিলেন,—“সে কেমন করে হবে ?”

স্বামিজী বলিলেন,—“কেন, দেখ না পল্লীগ্রামে ছোট জাতের সঙ্গে একটু মেশামিশি করলে তারা কেমন আগ্রহের সহিত ভদ্রলোকের সঙ্গ কর্ত্তে চায়। জ্ঞানপিপাসা যে সকল মানুষের ভেতর রয়েছে। তাই না তারা একজন ভদ্রলোক পেলে তাঁকে ঘিরে বসে, আর তাঁর কথা গিল্‌তে থাকে। তাঁরা সেই সুযোগে যদি নিজের বাড়ীতে ঐ রকম তাদের সব জড় করে সন্ধ্যার সময় গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, তাহ’লে রাজনৈতিক আন্দোলন করে হাজার বৎসরে যা না কর্‌তে পারা যাবে, তার শতগুণ বেশী ফল দশ বৎসরে হয়ে পড়বে।”

পরদিন অর্থাৎ ২৮শে মার্চ্চ স্বামিজী আলোয়ারের ভক্তমণ্ডলীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

জয়পুর ও খেতড়িতে

আলোয়ার হইতে স্বামিজী পাণ্ডুপোল অভিমুখে চলিলেন। পাণ্ডু-:পোল আলোয়ার হইতে ১৮ মাইল। প্রথমে তাঁহার সঙ্কল্প ছিল পদব্রজেই যাইবেন, কিন্তু ভক্ত ও বন্ধুদের উপরোধে তাহা না হইয়া তাঁহাকে রথে (এক প্রকার গরুর গাড়ী) যাইতে হইল। এই সকল ভক্ত ও বন্ধু আলোয়ার হইতে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে অন্ততঃ ৫০।৬০ মাইল পর্য্যন্ত যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। স্বামিজী প্রথমে তাঁহাদের নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহাদের মনঃক্ষোভের সম্ভাবনা দেখিয়া উহাতে সম্মতি দান করেন।

পাণ্ডুপোলে পৌঁছিয়া রাত্রিটা তাঁহারা তত্রত্য প্রসিদ্ধ হনুমানজীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে যাপন করিলেন এবং পরদিন প্রভাতে গোযান ত্যাগ করিয়া ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী টাহলা নামক গ্রামে যাত্রা করিলেন। পথটী পর্ব্বতসঙ্কুল ও হিংস্র বন্যজন্তু পরিপূর্ণ, কিন্তু তাঁহারা স্বামিজীর মধুর গল্প ও সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে গমন করিতে লাগিলেন।

টাহলায় নীলকণ্ঠ মহাদেবের একটি প্রাচীন মন্দির ছিল। তাঁহারা সেই মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সমুদ্রমন্থনকালে দেবাসুর যুদ্ধের পরিণামে বিষ উদ্গীর্ণ হইলে কেমন করিয়া মহাদেব তাহা পান করিয়া নীলকণ্ঠ ও মৃত্যুঞ্জয় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে করিতে স্বামিজী ঐ পৌরাণিক বৃত্তান্তের একটি মনোহর ব্যাখ্যা করিলেন। বলিলেন, 'সমুদ্রটা হচ্ছে মায়া-সমুদ্র। এই রূপ-রস-গন্ধাদিময় বিচিত্র

জগৎ হচ্ছে মায়ার রচনা। এখানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর নানারূপ ভোগ্যপদার্থ আছে, সেই সকল পদার্থ যতই ভোগ কর, পরিণামে তাহা হইতে হলাহল উদ্গীর্ণ হইবে। সেই হলাহল আত্মজ্ঞানের পরিপন্থী। কিন্তু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট তাহা ব্যর্থ, নিস্তেজ। ভূমানন্দে মগ্ন সন্ন্যাসী মায়ার কুহকে প্রতারিত হন না, বরং দেবাদিদেব শঙ্করের ন্যায় ইন্দ্রিয়-ভোগ-তৎপর জীবকুলকে মরণাদি ভয়াবহ অবস্থায় সাহায্য করেন ও তাহাদের উদ্ধারসাধনার্থ স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেন। তিনি মায়াকে বিনাশ করিয়া মৃত্যুর কবল হইতে জগৎকে রক্ষা করেন, সকলকে দেখান যে মায়াজয়ী পুরুষ মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ।' এই বলিয়া স্বামিজী কিয়ৎক্ষণ বিগ্রহের সম্মুখে ধ্যানস্থ রহিলেন।

পরদিন প্রভাতে তিনি এখান হইতে ১৮ মাইল দূরবর্তী নারায়ণীতে এক দেবীস্থানে গমন করিলেন। এখানে প্রতি বৎসর একটি সুবৃহৎ মেলা হয় ও দেবীর পূজার জন্য রাজপুতনার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেক নরনারীর সমাগম হয়। এখান হইতে স্বামিজী ভক্ত বন্ধুদিগকে বিদায় দিলেন ও একাকী ১৬ মাইল দূরবর্তী বসওয়া নামক রেলওয়ে ষ্টেশনে উপনীত হইলেন ও রেলে চড়িয়া জয়পুর যাত্রা করিলেন। এই স্থানের নিকটেই বান্দীকুই নামক ষ্টেশনে একজন ভক্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি ঐ স্থানে ট্রেনে উঠিলেন। তার পর জয়পুরে পৌছিয়া স্বামিজীকে একখানি ফটো তুলাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আলোয়ারবাসী বন্ধুগণ এ সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি আরও ধরিয়া বসিলেন। শিষ্যদিগের সন্তোষার্থ অগত্যা স্বামিজী অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইহাই তাঁহার পরিব্রাজকবেশের প্রথম চিত্র। ছবিখানিতে পরিব্রাজকের ভাব বেশ ফুটিয়াছিল।

আলোয়ার হইতে জয়পুরে আসিয়া স্বামিজী তথায় দুই সপ্তাহ রহিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণের পরিচয় লাভ করিয়া তিনি তাঁহার নিকট পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজী নিজে ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও তাঁহার অধ্যাপনা-প্রণালী তত সরল ছিল না। তিনি ক্রমান্বয়ে তিন দিবস ধরিয়া প্রথম সূত্রের ভাষ্যটি ব্যাখ্যা করিলেন, কিন্তু তথাপি স্বামিজীকে তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারিলেন না। চতুর্থ দিবসে বলিলেন,—'স্বামিজী, আমার আশঙ্কা হইতেছে, যখন তিনদিনেও প্রথম সূত্রের অর্থ আপনার বোধগম্য করাইতে পারিলাম না, তখন আমা দ্বারা আপনার বিশেষ উপকার হইবে না।' স্বামিজী পণ্ডিতজীর এই উক্তিতে অতিশয় লজ্জা বোধ করিয়া দৃঢ়পণ করিলেন, যে করিয়াই হউক নিজের চেষ্টায় ভাষ্যের অর্থ উপলব্ধি করিবেন এবং যতক্ষণ না অর্থবোধ স্পষ্ট হয়, ততক্ষণ অন্য কোন কার্য্য করিবেন না। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি নির্জ্জনে পুনঃ পুনঃ ভাষ্যটি পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে এমনই আশ্চর্য্য ফল ফলিল যে, পণ্ডিতজীর সাহায্যে তিন দিনেও যাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, নিজ চেষ্টায় তিন ঘণ্টায় তাহা জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে তিনি পণ্ডিতজীর নিকট উপস্থিত হইয়া ভাষ্যটি ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার সরল, সুচিন্তিত, গূঢ়লক্ষ্যার্থসম্পন্ন ব্যাখ্যা শ্রবণে পণ্ডিতজী একেবারে স্তম্ভিত। অনন্তর তিনি সূত্রের পর সূত্র ও অধ্যায়ের পর অধ্যায় অনায়াসেই বুঝিতে লাগিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি ইদানীং বলিতেন,—'সংকল্পই সব, মনে যদি আগ্রহ আসে, তবে কোন কাজ পড়িয়া থাকে না।'

জয়পুর ত্যাগ করিয়া আজমীর হইয়া তিনি আবু পর্ব্বতের রমণীয়

সৌন্দর্য্য দর্শনে গমন করিলেন। এখানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রায় আট কোটি টাকা ব্যয়ে একটী জৈন-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ন্যায় অপরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দির ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। ইহা নির্ম্মাণ করিতে চৌদ্দ বৎসর লাগিয়াছিল এবং দুইজন ধার্ম্মিক জৈন বণিক-ভ্রাতা ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। স্বামিজী কয়েক দিন ধরিয়া এই মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া দর্শন করিলেন ও তাহাদের গৌরবে সমগ্র ভারতের গৌরব অনুভব করিলেন। মন্দিরের সর্ব্বত্র দর্শন শেষ হইলে তিনি পর্ব্বতবক্ষ-শোভিত বিশাল হ্রদের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলেন। স্থানটি তাঁহার নিকট যেন নন্দন-কাননের ন্যায় মনোহর প্রতীত হইল। কিছুদিন এই ভূস্বর্গে অতিবাহিত করিয়া তিনি পুনরায় আজমীর যাত্রা করিলেন।

আজমীরে তিনি আকবর সাহের প্রাসাদ ও দরগা নামে প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাভাজন মুসলমান ফকির চিস্তি সাহেবের সমাধিক্ষেত্র দর্শন করিলেন। এখানে তিনি আর একটি জিনিষ দেখিলেন, যাহা ভারতের আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। সেটী ব্রহ্মার মন্দির।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে স্বামিজী আজমীর ত্যাগ করিয়া পুনরায় আবু পর্ব্বতে ফিরিয়া আসিলেন এবং এইবার ভাগ্যচক্রে খেতড়ির মহারাজের সহিত পরিচিত হইলেন। আবুতে তাঁহার কতকগুলি বন্ধু জুটিয়াছিল। তাহার মধ্যে কোটার রাজা ও ঠাকুর ফতেসিংহের উকীল ও উক্ত রাজার পূর্ব্ব মন্ত্রীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদেরই এক জনের ভবনে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার এক ভক্ত খেতড়ির রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহন লালকে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী সকাল হইতে বকিয়া বকিয়া তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, একটু ঘুমও আসিয়াছিল।

জগমোহনজী উচ্চশিক্ষিত, তাঁহার ধারণা সাধুর বেশে যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের অধিকাংশই চোর ছেঁচড়। সুতরাং সামান্য একটা কৌপীন ও বহির্বাস পরিহিত ব্যক্তিকে দেখিয়া তিনি প্রথমটা বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু অনতিবিলম্বে স্বামিজীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন মুন্সীজি তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। বহুক্ষণ আলাপের ফলে তাঁহার অনেকগুলি ভ্রান্ত ধারণা ও সন্দেহ দূর হইল এবং তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া স্থির করিলেন, মহারাজের সহিত স্বামিজীর আলাপ করাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু স্বামিজীকে ঐ কথা বলিলে তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা পরশু দিন হবে।' রাজার নিকট পৌঁছিয়া জগমোহনজী আদ্যোপান্ত সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিলে মহারাজ স্বামিজীর দর্শনলাভার্থ এতদূর ব্যগ্র হইলেন যে, স্বয়ংই তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু স্বামিজীর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিবামাত্র তিনি নিজে আসিয়া মহারাজকে দর্শন দিলেন।

খেতড়িরাজ মহাসমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যথা-বিহিত শিষ্টালাপের পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বামিজী, জীবনটা কি?' স্বামিজী উত্তর দিলেন,—"প্রতিকূল অবস্থাচক্রের মধ্যে জীবের আত্মস্বরূপ প্রকাশের নামই জীবন।" মহারাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আচ্ছা স্বামিজী শিক্ষা কি?" স্বামিজী উত্তর করিলেন,—"কতকগুলি সংস্কারকে অস্থিমজ্জাগত করার নামই শিক্ষা।" (Education is the nervous association of certain ideas) বিষয়টি আরও বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য বলিলেন,—'যতক্ষণ না কোন চিন্তা বা ভাব মনোমধ্যে এরূপ দৃঢ় সংস্কারের আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, প্রতি স্নায়ু ও শিরায় তাহার কার্য্য প্রকাশ পাইতে থাকে, ততক্ষণ সেই চিন্তা বা

তাহাকে প্রকৃতপক্ষে স্বীয় মনের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ তিনি পরমহংসদেবের জীবনের কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করিলেন। বলিলেন যে, একখণ্ড ধাতু তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিবা মাত্র অঙ্গটি এমন কি নিদ্রাবস্থাতেই বাঁকিয়া যাইত—কাঞ্চন-ত্যাগে তিনি এমনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনটা যেন পবিত্রতার পূর্ণ বিকাশ ও মানবমনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার আদর্শ দৃষ্টান্তস্বরূপ।

এইরূপে দিনের পর দিন স্বামিজীর জ্ঞানগর্ভ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া মহারাজ তাঁহার এতদূর অনুরাগী হইয়া উঠিলেন যে, একদিন প্রস্তাব করিলেন,—'স্বামিজী আপনি আমার রাজ্যে চলুন। সেখানে আমি পরমযত্নে আপনার সেবা করিব।' স্বামিজী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে বলিলেন,—'আচ্ছা মহারাজ, তাহাই হইবে। আমি আপনার সহিত গমন করিব।' কয়েকদিন পরে রাজা, পাত্র-মিত্র সহচর লইয়া ট্রেণে জয়পুর গমন করিলেন ও পরে রথে চড়িয়া ৯০ মাইল দূরবর্ত্তী খেতড়িতে পৌছিলেন।

মহারাজ স্বামিজীকে পাইয়া পরম আহ্লাদে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামিজী সত্য কি?'

স্বামিজী বলিলেন,—'মহারাজ, পূর্ণ সত্য এক ও অদ্বিতীয়। তবে সাধারণতঃ আমরা যে গুলিকে সত্য বলিয়া মনে করি, সে গুলি সব আপেক্ষিক হিসাবে সত্য। জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এক সত্য ত্যাগ করিয়া অপর সত্য গ্রহণ করে। যেটি ত্যাগ করে সেটি যে মিথ্যা তাহা নহে, তবে যেটি নূতন ধরে, সেটি আরও উচ্চতর। এ অবস্থায় চরম সত্যের উপলব্ধি নাই। চরম সত্যের উপলব্ধি হইলে আপেক্ষিক সত্যজ্ঞানের লোপ হয়।'

মহারাজ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কোন লোকের নিকট এরূপ মৌলিক চিন্তাপূর্ণ বাক্যসমূহ শ্রবণ করেন নাই। তিনি স্বামিজীর সঙ্গ-লাভে উত্তরোত্তর অধিকতর প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন এবং খেতড়ি পৌঁছিবার কয়েকদিন পরেই তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করি-লেন। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। মনে হয় রাজা হইয়া এরূপ ভাবে গুরুসেবা অল্প লোকেই করিয়াছেন। গভীর রজনীতে মহারাজ শয্যাত্যাগ করিয়া নিদ্রিত গুরুর পদসেবা করিতেন। প্রথম দিন যখন নিদ্রাভঙ্গে স্বামিজী মহারাজকে ঐ ভাবে দেখিলেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু তিনি মহারাজকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেও মহারাজ শুনিতেন না। বলিতেন,—'স্বামিজী, আমি আপনার দাসানুদাস শিষ্য। আপনি আমায় এ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না।' এমন কি দিবাভাগে প্রকাশ্য রাজসভাতেও তিনি ঐ ভাবে স্বামিজীর সেবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেন এবং স্বামিজীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও বিবিধ প্রকারে তাঁহার প্রতি প্রভুবৎ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু স্বামিজী সভাসদ্‌বর্গের সম্মুখে কিছুতেই তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতেন না, বলিতেন, 'উহাতে প্রজার চক্ষে রাজার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।'

এইভাবে অধ্যয়ন, উপদেশদান ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় খেতড়িতে বহুসপ্তাহ অতীত হইল। রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিলেও স্বামিজী ঠিক সন্ন্যাসীর ন্যায় থাকিতেন—সেই পূজা, পাঠ, ইষ্টচিন্তা ও জগজ্জননীর চরণে আত্মনিবেদন! অনুক্ষণ এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজসভায় নারায়ণ দাস নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সমগ্র রাজপুতনার মধ্যে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ; ইঁহার সহিত আলাপ হওয়ায় স্বামিজী দেখিলেন, পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করিবার এক উত্তম সুযোগ উপস্থিত। তিনি পণ্ডিতজীর নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন

করিলে পণ্ডিতজী অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথম দিনই পড়াইয়া বলিলেন,—'মহারাজ, আপ্‌কো মাফিক বিদ্যার্থী মিল্‌না মুস্কিল' (অর্থাৎ আপনার ন্যায় ছাত্র লাভ করা বড় কঠিন।) পণ্ডিত মহাশয় একদিন একটু বেশী করিয়া পড়াইলেন। পরদিন তিনি সেই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিলে স্বামিজী পূর্ব্বদিনের প্রসঙ্গে যে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহা সমস্ত আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতজী চমৎকৃত হইলেন ও পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বেশী পড়াইতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল এই ভাবে অতীত হইলে পণ্ডিতজী দেখিলেন, স্বামিজী মধ্যে মধ্যে এমন সব কূট-প্রশ্ন উত্থাপন করেন, যাহার উত্তর তিনি খুঁজিয়া পান না। একদিন তিনি স্বামিজীকে স্পষ্টই বলিলেন,—'স্বামিজী, আমার আর আপনাকে শিখাইবার অধিক কিছুই নাই। আমি যাহা জানিতাম, তাহা আপনাকে দান করিয়াছি।' স্বামিজী পণ্ডিতজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন ও তাঁহার প্রতি এতদূর দয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। বস্তুতঃ শেষে তিনিই একরূপ পণ্ডিজীর শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; কারণ পণ্ডিতজীর দ্বারা যে সব প্রশ্নের সুমীমাংসা হইত না, তিনি নিজেই তাহার মীমাংসা করিতেন। খেতড়িরাজের সভায় অনেক সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ দর্শনে সুপণ্ডিত ব্যক্তির সমাগম হইত। তাঁহারাও সকলে স্বামিজীকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

স্বামিজী যখন কোন পুস্তক পাঠ করিতেন, তখন পুস্তকের দিকে চাহিয়া অতি সত্বর পাতা উল্‌টাইয়া যাইতেন। মহারাজ তাহা দেখিয়া একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বামিজী, আপনি এত শীঘ্র কি

প্রকারে পড়েন ?” স্বামিজী বলিলেন, “বালকে যখন প্রথম পড়িতে শিখে, তখন এক একটি অক্ষর দুবার তিনবার উচ্চারণ করিয়া তৎপরে শব্দটি উচ্চারণ করে। এ সময়ে তাহার দৃষ্টি থাকে, শুধু এক একটি অক্ষরের উপর। কিন্তু যখন আরও বেশী শিক্ষা করে, তখন তাহার নজর এক একটি অক্ষরের উপর না পড়িয়া এক একটি শব্দের উপর পড়ে এবং অক্ষরের উপলব্ধি না হইয়া একেবারে শব্দের উপলব্ধি হয়। ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা এক একটি Sentence (বাক্য) এর উপর নজর পড়ে ও তাহারই উপলব্ধি হয়। এইরূপে ভাব গ্রহণের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইলে এক নজরে পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা উপলব্ধি হয়। ইহা কিছু নহে, শুধু অভ্যাস, ব্রহ্মচর্য্য ও একাগ্রতার ফল, যে কেহ চেষ্টা করিলে পারিবে। আপনি চেষ্টা করুন, আপনারও হইবে।”

আর একদিন মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘স্বামিজী, বিধি বা নিয়ম কি ?’ (What is law ?) স্বামিজী ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া বলিলেন,—“Law is the mode in which the mind grasps a series of phenomena” (মন যে প্রণালীতে কতকগুলি বস্তুর ধারণা করে তাহাই নিয়ম।) অর্থাৎ বহির্জগতে নিয়মের কোন অস্তিত্ব নাই, তবে কতকগুলি ঘটনা-পরম্পরার উপলব্ধি আমাদিগের মনে যে প্রকারে হয়, তাহাকেই আমরা নিয়ম বলিয়া থাকি। মন আপন সংস্কারগুলিকে বিভিন্ন সমজাতীয় শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া লয় ও প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত বিষয়গুলির সাধারণ লক্ষণসমূহকে এক একটি নিয়মাকারে প্রকাশ করে। এইরূপে বাহ্য বস্তুর সংস্কারের উপর বুদ্ধির প্রতিক্রিয়া হইতে প্রত্যেক নিয়মের উৎপত্তি হয়।” এই প্রসঙ্গে স্বামিজী সাংখ্যদর্শনের কথা পাড়িয়া দেখাইলেন যে, বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের সহিত সাংখ্যের সিদ্ধান্তগুলির বিশেষ ঐক্য আছে।

বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ প্রায়ই হইত। স্বামিজী, মহারাজকে ঐ বিষয় আলোচনায় অতিশয় উৎসাহিত করিতেন এবং বর্ত্তমানকালে এদেশে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও তত্ত্বসংগ্রহের বহুল প্রচলন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, ইহা তাঁহার চিত্তে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। এমন কি তিনি মহারাজের জন্য কয়েকখানি সরল বৈজ্ঞানিক পুস্তক (Science primer) ও যন্ত্রাদি আনাইয়া স্বয়ং কিছুদিন তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন। পরে নিয়মমত শিক্ষা দিবার জন্য আর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়।

এ সময় খেতড়িরাজ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার একদিন মনে হইল, বোধ হয় স্বামিজী আশীর্ব্বাদ করিলে তিনি সন্তানের মুখদর্শন করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি একদিন স্বামিজীর নিকট দুঃখ করিয়া বলিলেন, 'স্বামিজী, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার একটি পুত্রলাভ হয়। আমার বিশ্বাস আপনি যদি শুধু একবার মুখ দিয়া ঐ কথাটি উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেই অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।' স্বামিজী তাঁহার বিশ্বাস ও ঐকান্তিক আগ্রহ দর্শনে প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পাঠক দেখিবেন, আজন্ম ব্রহ্মচারীর এ আশীর্ব্বাদ বিফল হয় নাই।

একদিন নিদাঘ সন্ধ্যায় সুশীতল বায়ুসেবনার্থ মহারাজ কয়েকজন বয়স্যের সহিত প্রমোদ উদ্যানে উপবিষ্ট আছেন ও বিশাল পুরী মধ্যে কয়েকজন নর্ত্তকী বীণাযন্ত্র সহযোগে সুললিত সঙ্গীত-তান তুলিয়াছে; এমন সময় মহারাজের মনে স্বামিজীকে সেই স্থানে আনয়ন করিবার ইচ্ছা উদিত হইল, কারণ তাঁহার হৃদয়ে প্রফুল্লতা ছিল না, সেথায় কি যেন একটা শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন। তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারীকে স্বামিজীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। স্বামিজী তখন ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। ধ্যান সাঙ্গ হইলে সংবাদ পাইয়া মহারাজের

নিকট আগমন করিলেন। কিঞ্চিৎ ধর্ম্মপ্রসঙ্গের পর মহারাজ একজন নর্ত্তকীকে একটী গীত গাহিতে আদেশ করিলেন। নারীকণ্ঠোচ্চারিত কোমল স্বরলহরী শ্রুত হইবামাত্র স্বামিজী সেস্থানে থাকা অনুচিত বিবেচনায় গাত্রোত্থান করিলেন, কারণ প্রথমতঃ তিনি স্ত্রীলোকের সঙ্গীত কখনও শুনিতেন না, দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীত-ব্যবসায়ী স্ত্রীলোক সাধারণতঃ অসচ্চরিত্রা বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। কিন্তু তিনি উঠিবামাত্র মহারাজ বিশেষ অনুরোধ সহকারে বলিলেন,—'স্বামিজী, ইহার একটি গান শুনিয়া যান। সে গান শুনিলে সাধারণের মনেই অতি উচ্চভাবের উদয় হয়, সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই আনন্দ পাইবেন।' রাজা কর্ত্তৃক এরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া অগত্যা স্বামিজী পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। ভাবিলেন, এই গানটি সমাপ্ত হইলেই চলিয়া যাইবেন। রমণী গাহিতে লাগিল। রজনী অন্ধকারময়ী স্থির ও শান্ত নীলাকাশ তারকাখচিত এমন সময়ে বৈষ্ণব শিরোমণি সুরদাসের অপূর্ব্ব পদাবলী পর্দ্দায় পর্দ্দায় নৈশবায়ু তরঙ্গ ভেদ করিয়া উঠিল—

"প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো,
সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ,
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নাহি হোয়,
তুঁহু এক কাঞ্চন করো॥
এক নদী, এক লহর, বহত মিলি নীর ভরো।
যব মিলিহে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গা নাম পরো॥
এক মায়া এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥"

গান শুনিয়া স্বামিজী অতিশয় প্রীত ও ততোধিক বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন যে গায়িকা সামান্যা রমণী হইলেও আজ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই সার সত্যটী সুপরিস্ফুটভাবে তাঁহার মর্ম্মবোধ করিয়া দিয়াছে। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন, 'গান শুনিয়া ভাবিলাম, এই আমার সন্ন্যাস? আমি সন্ন্যাসী আর এই স্ত্রীলোক পতিতা নারী, এ ভেদজ্ঞান ত আজিও যায় নাই! সর্ব্বভূতে ব্রহ্মানুভূতি কি কঠিন!' শুনা যায় চণ্ডালের বাক্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মন হইতে ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছিল, কে জানে কত তুচ্ছ ঘটনা হইতে কত মহৎ ফল প্রসূত হয়! আজিও তাহাই হইল। গায়িকার ভাবোচ্ছ্বসিত কণ্ঠের প্রতিশব্দটী যেন অগ্নিশলাকার ন্যায় স্বামিজীর ভেদবুদ্ধিকে বিদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল,—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' স্বামিজী বলিয়া উঠিলেন, 'মা, আমি অপরাধ করিয়াছি, আপনাকে ঘৃণা করিয়া উঠিয়া যাইতেছিলাম। আপনার গানে আমার চৈতন্য হইল।'*

উপরোক্ত বিবরণগুলি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, স্বামিজী দিবারাত্র রাজপ্রাসাদেই অতিবাহিত করিতেন। তিনি প্রায়ই দীন দরিদ্র ভক্তমণ্ডলীর গৃহে দর্শন দিতেন। সমগ্র খেতড়ি সহর তাঁহার গুণে মোহিত হইয়াছিল এবং তিনি মহারাজকে যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার দীনতম প্রজাকেও সেই চক্ষে দেখিতেন। তিনি তাহাদিগের নিকট বহুবার পরমহংসদেবের চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহারা পরমহংসদেবের দর্শনলাভ করে নাই বটে, কিন্তু স্বামিজীর দৈনন্দিন জীবনের পবিত্রতা ও মধুরতা অনুভব করিয়া মনে মনে তাঁহাকেই পরমহংসদেবের স্থানে বসাইয়া পূজা করিত।

---

* এই ঘটনাটী সম্ভবতঃ খেতড়িরাজের জয়পুরবাটীতে সংঘটিত হয়।

গুজরাট প্রদেশে

স্বামিজীর হৃদয়ে আবার পর্য্যটন-স্পৃহা উদিত হইল। খেতড়ি ত্যাগ করিয়া তিনি আজমীর অভিমুখে গমন করিলেন। আজমীরে দু এক দিন কাটাইয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আমেদাবাদ নগরে গমন করিলেন। কয়েকদিন ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার পর অবশেষে মিঃ লালশঙ্কর উমীয়াশঙ্কর নামক একজন সাব্‌জজের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐখানে থাকিয়া আমেদাবাদ নগর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে যে সকল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দর্শনীয় বিষয় ছিল তাহা দর্শন করিলেন। ঐ সকল স্থান দর্শনকালে তাঁহার মনে ঐ সকল স্থান-সংশ্লিষ্ট নানা প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি উদিত হইল। পূর্ব্বে আমেদাবাদ গুজরাটের সুলতানদিগের রাজধানী ছিল, তখন ভারতবর্ষের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ ও সুরম্য নগর বলিয়া ইহার খ্যাতি ছিল। এমন কি সার টমাস রো পর্য্যন্ত ইহাকে "A goodly city as large as London" (লণ্ডনের ন্যায় সুন্দর সহর) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামিজীর মনে হইল যে এক সময়ে আমেদাবাদের নাম ছিল কর্ণাবতী। জৈনদিগের উন্নতিকালের নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি মনোহর মন্দির এবং মুসলমানদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ কতকগুলি মসজীদ ও সমাধি-মন্দির এখনও ঐ সহরে বিদ্যমান আছে। স্বামিজী সেগুলি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন। এখানেও ইনি জৈন পণ্ডিতদিগের সহিত আলাপ করিয়া আপনার জৈন-ধর্ম্মজ্ঞান বৃদ্ধি করিলেন এবং আরও কয়দিন কাটাইয়া সেপ্টেম্বরের শেষভাগে কাটিয়াওয়াড়ের অন্তর্গত ওয়াডওয়ান নামক স্থানে যাত্রা করিলেন।

ওয়াডওয়ানে রণিকদেবীর প্রাচীন মন্দির দর্শন করিয়া তিনি লিমড়ী অভিমুখে গমন করিলেন। লিমড়ীরাজ্য তুলার জন্য বিখ্যাত। ইহার প্রধান নগরের নামও লিমড়ী। পথে স্বামিজী ভিক্ষা করিয়া শরীর-ধারণ করিয়াছিলেন। দিবসে ভ্রমণ করিয়া কাটাইতেন, রাত্রিতে যেখানে হয় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এইভাবে তিনি লিমড়ী সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, নিকটেই সাধুদিগের একটা আড্ডা আছে। সেখানে গমন করিয়া একটী নির্জ্জন আলয় দেখিলেন। সাধুরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল যে, তাঁহার যতদিন ইচ্ছা ঐস্থানে যাপন করিতে পারেন। বহু ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ক্ষুধাও বিলক্ষণ পাইয়াছিল, সুতরাং কিঞ্চিৎ আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার মানসে তিনি এস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু স্থানটী যে কিরূপ সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ ধারণা ছিল না। দু' এক দিন থাকিবার পর তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলেন যে, আড্ডাধারী লোকগুলা একটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধর্ম্মধ্বজী (বীজমার্গী সম্প্রদায় ভুক্ত)। ধর্ম্মের নামে যত কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠানই তাহাদের নিত্য ক্রিয়া। কারণ পার্শের ঘর হইতে তিনি ঐ সকল ইন্দ্রিয়-পূজকের প্রার্থনা ও মন্ত্রপাঠ শুনিলেন এবং কতকগুলি স্ত্রীলোকের কণ্ঠশব্দও তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। এই সব ব্যাপার দেখিয়া তিনি পাছে তাহারা কোন অনিষ্ট করে, এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু কি বিপদ! যেই তিনি দ্বার খুলিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে গেলেন, অমনি দেখিলেন যে, দ্বারটী বাহির হইতে তালা বন্ধ, আর ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলেন, লোকগুলা তাঁহার উপর খুব নজর রাখিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি এখন তাহাদের হাতে বন্দী!

একাকী বিদেশে এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া স্বভাবতঃ তাঁহার মনে বিষম উদ্বেগের সঞ্চার হইল। কিন্তু তারপর তিনি যখন দুর্ব্বৃত্তদিগের অভিপ্রায় অবগত হইলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বশরীর ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুর্ব্বৃত্তদিগের অধ্যক্ষ তাঁহাকে আসিয়া কহিল,—"তুমি একজন উচ্চদরের সাধু বলিয়া বোধ হইতেছে, সম্ভবতঃ তুমি বহুবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়াছ। এখন তুমি এই তপস্যার ফল আমাদের দান কর। আমরা একটী বিশেষ সাধনার অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য তোমার ন্যায় একজন ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গ করা বিশেষ আবশ্যক। অতএব তুমি প্রস্তুত হও।" স্বামিজী তাহার প্রস্তাব শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। লোকটী কি পাগল নাকি? বলে কি? তাঁহার মনে হইল পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন ধর্ম্মের নামে কোন কোন সম্প্রদায় এইরূপ নানাবিধ গুপ্ত পাপাচরণ করিয়া থাকে এবং তাহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য এমন কি নরহত্যাদিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তিনি বিশেষ ভীত হইলেন বটে, কিন্তু বাহিরে কোনরূপ চাঞ্চল্য বা ভয় প্রকাশ করিলেন না। শুধু চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে ইহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। সে দিবস তাহারা তাঁহাকে আর বেশী কিছু বলিল না, শুধু বন্দী করিয়া রাখিল। তিনি সেই নির্জ্জন কক্ষে পড়িয়া একান্ত চিত্তে স্বীয় ইষ্টদেবতার নাম জপ ও বিপদ্‌তারিণী জগদম্বাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

এখানে আসার পর একটী বালক প্রায় স্বামিজীর নিকট যাতায়াত করিত ও প্রথম দর্শনাবধি তাঁহার অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল। সে বালকটি যখন তখন তাঁহাকে দেখিতে আসিত। আড্‌ডার লোকেরা তাহাকে কোনরূপ সন্দেহ করিত না বা স্বামিজীর নিকট যাইতে

তাহাকে নিষেধও করিত না। পরদিবস সেই বালকটী স্বামিজীকে দেখিতে আসায় স্বামিজীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি আনুপূর্ব্বিক তাহাকে সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন। বালকটী তাঁহার বিপদ বুঝিতে পারিয়া অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তাহার দ্বারা কোন সাহায্য হইতে পারে কি না। স্বামিজী মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া সাগ্রহে বলিলেন, 'হাঁ হাঁ, বৎস, তোমার দ্বারাই আমার উদ্ধার হইবে।' তিনি একখণ্ড কাঠের কয়লা দ্বারা একটা খোলামকুচির উপর দু'চার কথায় তাঁহার বিপদের সংবাদ লিখিয়া বালকটীর হস্তে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "এই লও। তোমার চাদরের ভিতর এইটী লুকাইয়া লইয়া এখান হইতে বাহির হও। তারপর যত জোরে পার দৌড়িয়া রাজবাটীতে পৌঁছিবে এবং সেখানে আর কেহ নয় স্বয়ং মহারাজের হস্তে ইহা প্রদান করিয়া আমার অবস্থার কথা তাঁহাকে সব খুলিয়া বলিবে।" বালকটী ঠিক তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিল। যেন কিছুই হয় নাই, এইভাবে আড্ডা হইতে বাহির হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে রাজবাটীতে উপস্থিত হইল এবং স্বয়ং লিমড়ীরাজের নিকট সমুদয় ঘটনা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিল। মহারাজ এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ কয়েকজন দেহরক্ষীকে স্বামিজীর উদ্ধারার্থ প্রেরণ করিলেন এবং আড্ডার চতুর্দ্দিকে সতর্ক প্রহরীসমূহ সন্নিবেশ করিলেন।

প্রাসাদে উপনীত হইয়া স্বামিজী রাজার নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। মহারাজ এই অত্যাচারকাহিনী শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অচিরে অত্যাচারী পাষণ্ডদিগের দমন ও তাহাদের শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার অনুরোধে স্বামিজী প্রাসাদেই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং

নানাবিধ সৎপ্রসঙ্গ ও ধর্ম্মালোচনার দ্বারা মহারাজের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদে অবস্থানকালে স্থানীয় পণ্ডিতদিগের সহিত সংস্কৃতভাষায় অনেক বিচার হইত। শুনা যায় গোবর্দ্ধনমঠের পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করাচার্য্যের সহিত তাঁহার এ সময় সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তিনি পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারকালে তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। লিমড়ীতে কয়েক দিন অবস্থানের পর স্বামিজী মহারাজের নিকট হইতে তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট কতকগুলি পরিচয়-পত্র গ্রহণ করিয়া জুনাগড় যাত্রা করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে পথে একাকী ভ্রমণকালে বিশেষ সাবধান হইবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামিজীও ইদানীং যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা হইতে বাসস্থান নির্ণয় বিষয়ে সতর্ক হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

জুনাগড় যাইবার পথে লিমড়ীর ঠাকুর সাহেবের পরিচয়-পত্র লইয়া স্বামিজী ভাবনগর ও শিহোর দর্শন করিতে গেলেন। জুনাগড় পৌঁছিয়া তত্রত্য রাজদেওয়ান বাবু হরিদাস বিহারীদাসের ভবনে আশ্রয় লাভ করিলেন। দেওয়ান সাহেব তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সমুদয় রাজকর্ম্মচারীকে স্বামিজীর সকাশে আহ্বান করিয়া একটি সভা করিতে লাগিলেন। সেখানে সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া স্বামিজীর কথোপকথন শ্রবণ করিতেন। কোন কোন দিন রাত্রি অধিক হইয়া যাইত, কেহ বুঝিতে পারিত না কোন্ স্থান দিয়া সময় চলিয়া গেল। দেওয়ান আফিসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সি, এচ, পাণ্ডিয়া (C. H. Pandya) স্বামিজীর একজন প্রধান গুণানুরাগী ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কিছুদিন তাঁহাকে স্ব-ভবনে রাখিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"জুনাগড়ে আমরা সকলেই স্বামিজীর অকপট ভাব, আড়ম্বরশূন্যতা,

বিবিধ শিল্প-বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান, উদার মতসমূহ, ধর্ম্মপরায়ণতা, প্রাণস্পর্শী বাগ্মিতা এবং অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই সকল গুণ ব্যতীত সঙ্গীতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা এবং বহুবিধ ভারতীয় কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল। এমন কি তিনি রন্ধনাদি কার্য্যেও সুপটু ছিলেন এবং অতি উত্তম রসগোল্লা প্রস্তুত করিতে পারিতেন। আমরা সকলেই তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলাম।”

জুনাগড়ে স্বামিজী মহর্ষি ঈশার কথা প্রায় বলিতেন। তিনি বলিতেন যে, প্রধানতঃ রোমসম্রাট্ Constantine ও Christian Father দিগের চেষ্টায় ঈশার প্রভাব সমুদয় পাশ্চাত্য জগতের উপরে বিস্তৃত হইয়াছিল ও তত্রত্য রীতিনীতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-দর্শনাদি নূতন ছাঁচে গঠিত হইয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। তাঁহার বাক্যগুলি শ্রোতৃগণের চিত্তে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি নানা ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখাইতেন, সন্ন্যাসী ঈশার উপদেশের সহিত ইউরোপের কত কি নিগূঢ়-ভাবে সম্বদ্ধ। এইরূপে ইউরোপের মধ্যযুগ, রাফেলের চিত্রাবলী, মহর্ষি ফ্রান্সিসের ধর্ম্মপ্রাণতা, গথিক গীর্জ্জা নির্ম্মাণ, ক্রুসেড নামক বিখ্যাত ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে ইউরোপের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যন্ত আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িত। কিন্তু তিনি ঈশার গুণকীর্ত্তনে শতমুখ হইলেও বর্ত্তমানকালের পাদ্রীদিগের উপর তীব্র কশাঘাত করিতে ছাড়িতেন না। বলিতেন, তাহারা কেহই ঈশার ত্যাগ-বৈরাগ্যের অধিকারী হইতে পারে নাই, আর দুঃখের বিষয় এদেশে আসিয়া ঈশার উচ্চাদর্শ এদেশের লোকের সম্মুখে স্থাপন না করিয়া ক্রমাগত এদেশের প্রাচীন মহাত্মাদিগের অজস্র নিন্দাবাদ ও ধর্ম্মাদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে কলেজে

পাঠকালে খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদিগের সহিত তাঁহার কিরূপ তুমুল তর্কবিতর্ক হইত, তাহাও বর্ণনা করিতেন ও বলিতেন, যদি ঈশা স্বয়ং আজ ভারতে আসিতেন, তাহা হইলে এদেশের নীতি বা ধর্ম্মশিক্ষাকে তুচ্ছ বা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগের মাহাত্ম্যই প্রচার করিতেন ও এদেশের লোকের সুখ-দুঃখের ভাগী হইতেন। কিন্তু বৈদেশিক সাধুদিগের প্রতি এরূপ উদারভাব পোষণ করিলেও হিন্দুধর্ম্মের সনাতন মহিমা তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। জুনাগড়বাসীদিগের নিকট তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন যে, পাশ্চাত্যের ধর্ম্মাদর্শ হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবে বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পশ্চিম ও মধ্যএসিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বহুবার পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় ও চিন্তার আদান প্রদান করিয়াছে।

সনাতন ধর্ম্মের গভীরতা উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক সময় পরমহংসদেবের জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁহার অমৃতোপম উপদেশসমূহ সকলকে শুনাইতেন। এইভাবে সুদূর জুনাগড়ের লোকেরাও পরমহংসদেবের বিষয় জানিতে ও তাঁহার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল এবং অচিরেই অনেক ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের এই নববৈজয়ন্তীতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। জুনাগড়েও স্বামিজীর সহিত অনেক প্রাচীন-পন্থী হিন্দু পণ্ডিতের সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ক বিচার হইয়াছিল।

জুনাগড় নগর হইতে কয়েক মাইল দূরে সুবিখ্যাত গীর্ণার পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বত হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও জৈন সর্ব্বসম্প্রদায়ের নিকট পবিত্র ও বহুবিধ প্রাচীন স্মৃতি ও ধ্বংসাবশেষের দৃশ্যস্থল। এখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির, মসজীদ ও সমাধিস্থান বর্ত্তমান

আছে। হিন্দুদিগের কীর্ত্তির কতকগুলি ভগ্নাবশেষ বিশেষতঃ 'খাপড়া-খোদির' নামে কতকগুলি গুহা বহুদিন ধরিয়া বহু সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মঠের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে। স্বামিজী অতিশয় আগ্রহের সহিত এগুলি দর্শন করিলেন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার পর্ব্বতটীই ভাল লাগিল। পর্ব্বতে যাইতে হইলে যে সুবিখ্যাত শিলাস্তম্ভে সম্রাট্ অশোক তাঁহার চতুর্দ্দশটী আদেশ ক্ষোদিত করিয়াছিলেন, তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা ছাড়া পথে পৌরাণিক বৌদ্ধ ও জৈনকালের অনেক দেখিবার বস্তু আছে। ভবনাথ নামে খ্যাত শিবের মন্দিরে সদাসর্ব্বদা বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতেও আশে পাশে বহু মন্দির দৃষ্ট হয়। দেখিলে স্থানটী যে বহু প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। মন্দিরে উঠিবার রাস্তাটী অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিলে ক্রমশঃ অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখা যায় এবং সময়ে সময়ে একটা প্রকাণ্ড দুরারোহ শিলার ঠিক প্রান্তভাগে আসিয়া পড়িতে হয়। ১৫০০ ফিট উপরে 'ভৈরো ঝাম্পা' (বা ভীষণ লম্ফ) নামে একটী স্থান আছে। এখান হইতে অনেক ভক্তসাধু ভক্তির আতিশয্যে ১০০০ ফিট বা ততোধিক গভীর খাদে লম্ফ দিয়া পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। স্বামিজীর পার্ব্বত্যপথে ভ্রমণ করা পূর্ব্ব হইতেই অভ্যাস ছিল, সুতরাং তিনি ক্লান্তিবোধ না করিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলেন। জুনাগড় হইতে ২৩৭০ ফিট উপরে একটী প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান আছে, তন্মধ্যে দুর্গের ন্যায় দুর্ভেদ্য ১৬টী জৈন মন্দির আছে। এখানে আসিয়া স্বামিজী মন্দিরগুলির অত্যদ্ভুত নির্ম্মাণ-কৌশল ও মণিরত্ন-বিভূষিত তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। তারপর প্রাচীন মহাপুরুষদিগের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ও ভারতের অতীত গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া

পুনরায় আরও উপরে উঠিতে লাগিলেন এবং অবশেষে মন্দিরের শিখরে উপনীত হইলেন। এ স্থানটী ৩৩৭০ ফিট উচ্চ। এখান হইতে যতদূর চক্ষু যায় দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার মনে হইল সমস্ত ভারতক্ষেত্র যেন একটী বিশাল ধর্ম্মমন্দির।

এই শিখর হইতে অবতরণ করিয়া তিনি আর একটী শিখরে অবধূত দত্তাত্রেয়ের পদাঙ্ক দর্শন করিবার জন্য আরোহণ করিলেন। নিম্নে বহুদূর বিস্তৃত শৈলমালা, অদূরে ৪ অঙ্কের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট একটী হ্রদ—লোকে বলে ব্রহ্মার কমণ্ডলুর আকার ঐরূপ। মোটের উপর গীরণার পাহাড় দেখিয়া স্বামিজী অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং তথায় সাধন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। অনতিবিলম্বে একটী নির্জ্জন গুহা আবিষ্কার করিয়া তাহাতে কিয়দ্দিন ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করেন ও জুনাগড়ে ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুদিগের নিকট বিদায় লইয়া ভুজরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিদায়কালে জুনাগড়ের দেওয়ান সাহেব ভুজরাজ্যের উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর কয়েকখানি পরিচয়-পত্র তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন।

এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হইতে পারে যে, ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর রাজা ও রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত এত আলাপ-পরিচয় করার কি প্রয়োজন? সত্য বটে আপাত-দৃষ্টিতে ইহা যেন স্বামিজীর চরিত্রের বিরুদ্ধভাব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, এই তেজস্বী পুরুষ যিনি চিরদিন দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন এবং দারুণ অভাব অনটনের মধ্যেও এক মুহূর্ত্তের জন্য অর্থের লালসা করেন নাই, যিনি মনে করিলে আপনার অসাধারণ মানসিক ও নৈতিক শক্তিবলে জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী, মানী ও সমাজ-শিরোমণি হইতে পারিতেন, তিনি স্বীয় নীচ স্বার্থসিদ্ধি বা রাজা মহারাজের প্রসাদা-

...জ্ঞায় তাঁহাদের দ্বারস্থ হন নাই। তাঁহার লক্ষ্য ছিল অতি উচ্চ, অতি মহৎ। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের কল্যাণসাধন করিতে হইলে শুধু ক্ষুৎপিপাসাকাতর দীন দরিদ্রের মধ্যে ধর্ম্ম ও সংশিক্ষা প্রচার করিলেই হইবে না, কিন্তু সম্পদে প্রতিষ্ঠিত, অর্থ ও জনবল সহায় রাজন্যবর্গের চিত্তের গতি, বিলাস-বৈভব হইতে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রভু, প্রজাদিগের পালক, রক্ষক ও সকল উন্নতির মূল। সুতরাং তাঁহাদিগেরই মতি পরিবর্ত্তন হওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সাধারণ জনমণ্ডলীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিই তাঁহার প্রধান দৃষ্টি ছিল, রাজা ও রাজপুরুষগণের সাহায্যলাভের চেষ্টা শুধু সেই মূল উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ অবলম্বিত হইয়াছিল।

কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে তিনি মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ পরিব্রাজক-জীবন ত্যাগ করিয়া রাজারাজড়ার গৃহে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিতেন। আর তা ছাড়া তাঁহার অন্তঃকরণ বৈরাগ্যের বিমল দীপ্তিতে চির-সমুজ্জ্বল। ত্যাগী পুরুষের নিকট রাজপ্রাসাদই বা কি আর পর্ণকুটীরই বা কি? তিনি যখনই কোন রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, তখন এই বলা থাকিত, যে কোন দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইলে যেন দ্বার হইতে বিতাড়িত না হয়, আর বাস্তবিক হইতও তাহাই। কোন সাধারণ ব্যক্তি তাঁহার দর্শনকামনায় রাজপ্রাসাদে গিয়া কখনও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে নাই। তিনি যখন যেরূপ অবস্থায় থাকিতেন, তাহারা তাঁহার সহিত দেখা করিত। একদিন লোকে হয়ত দেখিল তিনি রাজোদ্যানে রাজ-পারিষদবর্গের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন বা চতুরশ্ববাহিত রাজশকটে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, তাহারাই আবার অনেক সময় দেখিত যে

পুনরায় আরও উপরে উঠিতে লাগিলেন এবং অবশেষে মন্দিরের শিখরে উপনীত হইলেন। এ স্থানটী ৩৩৩০ ফিট উচ্চ। এখান হইতে যতদুর চক্ষু যায় দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার মনে হইল সমস্ত ভারতক্ষেত্র যেন একটী বিশাল ধর্ম্মমন্দির।

এই শিখর হইতে অবতরণ করিয়া তিনি আর একটী শিখরে অবধূত দত্তাত্রেয়ের পদাঙ্ক দর্শন করিবার জন্য আরোহণ করিলেন। নিম্নে বহুদূর বিস্তৃত শৈলমালা, অদূরে ৪ অঙ্কের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট একটী হ্রদ—লোকে বলে ব্রহ্মার কমণ্ডলুর আকার ঐরূপ। মোটের উপর গীরণার পাহাড় দেখিয়া স্বামিজী অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং তথায় সাধন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। অনতিবিলম্বে একটী নির্জ্জন গুহা আবিষ্কার করিয়া তাহাতে কিয়দ্দিন ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করেন ও জুনাগড়ে ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুদিগের নিকট বিদায় লইয়া ভুজরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিদায়কালে জুনাগড়ের দেওয়ান সাহেব ভুজরাজ্যের উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর কয়েকখানি পরিচয়-পত্র তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন।

এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হইতে পারে যে, ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর রাজা ও রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত এত আলাপ-পরিচয় করার কি প্রয়োজন? সত্য বটে আপাত-দৃষ্টিতে ইহা যেন স্বামিজীর চরিত্রের বিরুদ্ধভাব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, এই তেজস্বী পুরুষ যিনি চিরদিন দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন এবং দারুণ অভাব অনটনের মধ্যেও এক মুহূর্ত্তের জন্য অর্থের লালসা করেন নাই, যিনি মনে করিলে আপনার অসাধারণ মানসিক ও নৈতিক শক্তিবলে জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী, মানী ও সমাজ-শিরোমণি হইতে পারিতেন, তিনি স্বীয় নীচ স্বার্থসিদ্ধি বা রাজা মহারাজের প্রসাদা-

আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের দ্বারস্থ হন নাই। তাঁহার লক্ষ্য ছিল অতি উচ্চ, অতি মহৎ। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের কল্যাণসাধন করিতে হইলে শুধু ক্ষুৎপিপাসাকাতর দীন দরিদ্রের মধ্যে ধর্ম্ম ও সৎশিক্ষা প্রচার করিলেই হইবে না, কিন্তু সম্পদে প্রতিষ্ঠিত, অর্থ ও জনবল সহায় রাজন্যবর্গের চিত্তের গতি, বিলাস-বৈভব হইতে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রভু, প্রজাদিগের পালক, রক্ষক ও সকল উন্নতির মূল। সুতরাং তাঁহাদিগেরই মতি পরিবর্ত্তন হওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সাধারণ জনমণ্ডলীর সুখ-দুঃখের প্রতিই তাঁহার প্রধান দৃষ্টি ছিল, রাজা ও রাজপুরুষগণের সাহায্যলাভের চেষ্টা শুধু সেই মূল উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়স্বরূপ অবলম্বিত হইয়াছিল।

কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে তিনি মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ পরিব্রাজক-জীবন ত্যাগ করিয়া রাজারাজড়ার গৃহে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিতেন। আর তা' ছাড়া তাঁহার অন্তঃকরণ বৈরাগ্যের বিমল দীপ্তিতে চির-সমুজ্জ্বল। ত্যাগী পুরুষের নিকট রাজপ্রাসাদই বা কি আর পর্ণকুটীরই বা কি? তিনি যখনই কোন রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, তখন এই বলা থাকিত, যে কোন দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইলে যেন দ্বার হইতে বিতাড়িত না হয়, আর বাস্তবিক হইতও তাহাই। কোন সাধারণ ব্যক্তি তাঁহার দর্শনকামনায় রাজ-প্রাসাদে গিয়া কখনও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে নাই। তিনি যখন যেরূপ অবস্থায় থাকিতেন, তাহারা তাঁহার সহিত দেখা করিত। একদিন লোকে হয়ত দেখিল তিনি রাজোদ্যানে রাজ-পারিষদবর্গের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন বা চতুরশ্ববাহিত রাজশকটে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, তাহারাই আবার অনেক সময় দেখিত যে

তিনি একাকী ধূলিপূর্ণ রাজপথে পদব্রজে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কোন দরিদ্র ভক্তের পর্ণকুটীরে দেখা করিতে চলিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি রাজা মহারাজা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের সংসর্গেই অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতেন, আর রাজাদিগের নিকট কখনও তাঁহাদিগের অনুগ্রহ প্রত্যাশীর ন্যায় শশব্যস্ত ভাবে অবস্থান করিতেন না। তাঁহার নিজের মধ্যে এমন একটা শক্তি ছিল যে, কোন রাজারাজড়াকে তাঁহার অপেক্ষা বিশেষ উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার নিজের প্রকৃতিই অনেকটা রাজপ্রকৃতির ন্যায় গম্ভীর ও গরীয়ান্ ছিল। তিনি নিজে কিছু বুঝিতে পারিতেন না—কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার অনেকেই তাঁহার ধরণ-করণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিত এবং বড় বড় পরিবারের অনেকেই তাঁহাকে দেশীয় রাজাদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হইবেন বলিয়া ভ্রম করিতেন।

অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং রাজা মহারাজদিগের সহিত অবস্থান না করিয়া তাঁহাদিগের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রীর আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন যে সাধারণতঃ রাজাদিগের অপেক্ষা এই সকল উচ্চপদস্থ রাজভৃত্যের ক্ষমতা অনেক অধিক। শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতির বা অন্য কোন প্রকার সংস্কার-কার্য্যে দেওয়ানেরাই প্রকৃতপক্ষে অধিকতর সাহায্য করিতে সমর্থ রাজারা ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়া এ সকল দিকে ইচ্ছাসত্ত্বেও তত দৃষ্টি রাখিতে পারেন না।

এই সব কারণে ভুজরাজ্যে উপনীত হইয়া তিনি তত্রত্য দেওয়ানের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বামিজীর জনৈক শিষ্যের সঙ্গে এই দেওয়ানজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন,

কিন্তু স্বামিজীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন,—"তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির ইয়ত্তা হয় না, তাঁহার দর্শনেই আনন্দ বোধ হইত এবং তাঁহার কথাবার্ত্তায় এমনি একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে, যে একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিত সেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া যাইত। অতি গভীর চিন্তাসমূহও তিনি অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেন।" জুনাগড়ের প্রধান অমাত্যের ন্যায় এই দেওয়ানজীর সহিতও উক্ত রাজ্যের শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি সম্বন্ধে স্বামিজী অনেক আলাপ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানেই যাইতেন, সর্ব্বাগ্রে সেই স্থানের আর্থিক অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং কৃষকদিগের অবস্থা ও জমীর অবস্থা কিরূপ সন্ধান লইতেন এবং শ্রমজীবীদিগের উন্নতির উপায় উদ্ভাবনের জন্য দিবারাত্র চিন্তা করিতেন। দেশীয় রাজ্যসমূহে হিন্দু-স্মৃতিকারদিগের ব্যবস্থানুযায়ী শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, এইটী তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল এবং রাজ-পুরুষেরা প্রজাসাধারণের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের বিষয় যাহাতে গভীরভাবে চিন্তা করেন, সেজন্য বিধিমত চেষ্টা করিতেন। তিনি যে সকল রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতেন, প্রত্যেক স্থানে তত্রত্য প্রধান রাজপুরুষদিগের হৃদয়ে সাধারণ প্রজার উন্নতিসাধন, হিন্দু-আদর্শানুযায়ী শাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তন এবং হিন্দুজাতির নব নব উদ্ভাবনী শক্তিশালী প্রতিভার পুনর্জাগরণের প্রবল বাসনা প্রজ্বলিত করিতেন। ইহাকেই তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তিনি যতই অধিক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, ততই দরিদ্র প্রজার অভাব অনটনের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচিত হইতে লাগিলেন।

ভুজরাজ্যে পৌঁছিয়া স্বামিজী প্রথমে দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ

করিলেন ও পরে তাঁহার সাহায্যে মহারাজের সহিতও পরিচিত হইলেন। মহারাজের সহিত তাঁহার যে সুদীর্ঘ আলাপ হয়, তাহার ফলে মহারাজের মনে তাঁহার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা অঙ্কিত হইয়া যায়। তিনি এখান হইতে দূরে ও নিকটে যত তীর্থ ছিল, সব জায়গায় ঘুরিলেন এবং বহু সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীর সঙ্গে মিশিয়া আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিলেন। তাহার পর জুনাগড়ে ফিরিয়া গিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করেন। বিশ্রামান্তে পুনরায় বহির্গত হইলেন। এবার ভেরাওয়াল ও সোমনাথ পত্তন—(লোকে যাহাকে সাধারণতঃ প্রভাস বলে) সেইদিকে চলিলেন। ভেরাওয়াল অতি প্রাচীন স্থান বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু সোমনাথের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অধিকতর হৃদয়স্পর্শী। প্রবাদ আছে যে, সোমনাথের প্রথম মন্দির সোমরাজ কর্ত্তৃক স্বর্ণ দ্বারা ও দ্বিতীয় মন্দির রাবণ কর্ত্তৃক রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মিত হয়। তৃতীয় বারে কৃষ্ণ এক দারুময় মন্দির নির্ম্মাণ করেন ও সর্ব্বশেষে ভীমদেব কর্ত্তৃক সেইস্থানে এক প্রস্তরময় মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা নাকি তিনবার ধ্বংস ও তিনবার পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাও কথিত আছে যে, পূর্ব্বে ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য দশসহস্র গ্রাম ইহার অধীন সম্পত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং তিন শত বাদক এই মন্দিরের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কালের করালকবলে নিপতিত এই বিরাট ধ্বংসস্তূপের নিকট আসিয়া স্বামিজী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন ও ভারতের অতীতগৌরব স্মরণ করিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে দেখিলেন, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বহুক্রোশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ধূলিপরমাণু হিন্দুর আধ্যাত্মিক ইতিহাসের পবিত্র স্মৃতি বহন করিতেছে। কারণ এইখানেই শ্রীকৃষ্ণ যোগসমাধিতে তনুত্যাগ করেন এবং এই খানেই যদুবংশীয়গণ পরস্পরের প্রাণবধ করিয়া সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত

হন। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, একজন কৃষ্ণকায় ব্যাধ-নিক্ষিপ্ত শরে শ্রীকৃষ্ণ হত হন। কথাটা কতদূর সত্য তাহা এখন নির্ণয় করা অসম্ভব বটে, কিন্তু ঐস্থানে স্বামিজী একজন কৃষ্ণকায় আদিম বাসীকে দেখিয়াছিলেন, তাহার আকার প্রকার অবিকল কাফ্রীর ন্যায়। ভেরাওয়াল-বাসীদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, সোমনাথের নিকটবর্ত্তী গীর পর্ব্বতে বহুকাল হইতে একদল কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী আছে, তাহাদের আকৃতি আফ্রিকা-বাসী নিগ্রোদিগের আকৃতি হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে, কিন্তু কতকাল ধরিয়া যে তাহারা ঐস্থানে বাস করিতেছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সোমনাথের মন্দির দেখিয়া তিনি সূর্য্যমন্দির দেখিতে গেলেন। এখন এই বহুকাল-প্রসিদ্ধ মন্দির মনোহর ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ভেরাওয়াল ও সোমনাথ উভয় স্থানই সমুদ্রতটে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত সোমনাথে তিনটী নদীর সঙ্গমস্থান বলিয়া একটী অতি পবিত্র স্নানতীর্থ আছে। এই তীর্থে স্নান করিয়া তিনি সমুদ্রতটে ভ্রমণ করিতে গেলেন। প্রভাসে পুনরায় ভুজরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁহার বৈদ্যুতিক আকর্ষণে মুগ্ধ ও গভীর বিদ্যাবত্তায় স্তম্ভিত হইয়া রাজা বলিলেন, "স্বামিজী, অনেকগুলা বই এক সঙ্গে পড়িলে যেমন মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়ে, আপনার কথা শুনিলেও ঠিক সেইরূপ হয়। আপনি এতটা প্রতিভা লইয়া কি করিবেন? একটা কোন বিরাট কার্য্য সম্পাদন না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না দেখিতেছি।" ভেরাওয়ালে অল্পদিন থাকিয়া তিনি পুনরায় জুনাগড়ে ফিরিয়া গেলেন। এই স্থানটী যেন তাঁহার কাথিয়াওয়াড় ও কচ্ছদেশ ভ্রমণের কেন্দ্রস্থলরূপে পরিণত হইয়াছিল। তৃতীয়বার জুনাগড় ত্যাগ করিয়া তিনি পোরবন্দরে

গমন করিলেন এবং তত্রত্য প্রধান মন্ত্রীকে দিবার জন্য একখানি পরিচয়-পত্র সঙ্গে লইলেন। ভাগবত পাঠকেরা যে সুদামাপুরীর কথা শ্রবণ করিয়াছেন, এই পোরবন্দরই সেই প্রাচীন সুদামাপুরী বলিয়া খ্যাত। এখানে স্বামিজী প্রাচীন সুদামামন্দির ও দর্শনযোগ্য অন্যান্য স্থান দেখিলেন। তারপর দেওয়ানজীর গৃহে যাইবামাত্র পরম সমাদরে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে দেওয়ানজী তাঁহাকে মহারাজের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। পোরবন্দরে তিনি ৮।৯ মাস ছিলেন এবং মহারাজের আহ্বানে রাজবাটীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে আরও একটু সুযোগ জুটিয়াছিল। মহারাজের সভায় কতকগুলি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের সাহায্যে স্বামিজী সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনাদি বিষয়ে বহুল আলোচনা করিতেন। দিবারাত্রই অধ্যয়নে মগ্ন থাকিতেন। শুধু অপরাহ্নে বিশ্রামের জন্য কখন কখন রাজকুমারদিগের সহিত অশ্বারোহণ বা অন্যান্য ক্রীড়ায় যোগ দিতেন।

পোরবন্দরে অবস্থানকালে তাঁহার অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত স্বামিজীর দেখা হয়। ঘটনাটী এইরূপ। ত্রিগুণাতীত স্বামী কিছুকাল হইতে তীর্থভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি দ্বারকা হইয়া জাহাজে করিয়া সম্প্রতি পোরবন্দরে উপস্থিত হইয়া তথায় হাটকেশ্বর শিবমন্দিরে উঠিয়াছিলেন। সেখানে কতকগুলি সাধু হিঙ্গলাজ তীর্থে গমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানটী পোরবন্দর হইতে বহুদূরে অবস্থিত এবং তাঁহারাও ইতঃপূর্ব্বে বহু পথ ভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত ও বিক্ষতপদ হইয়াছিলেন, সুতরাং পদব্রজে হিঙ্গলাজ গমনের আশা ত্যাগ করিয়া ষ্টীমার যোগে প্রথমে করাচী ও পরে করাচী হইতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে মরুভূমি পার হইয়া সেস্থানে যাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ইহাতে অর্থের প্রয়োজন। এখন অর্থ

কোথা হইতে আসে? অনেক যুক্তি পরামর্শ হইল, কিন্তু কিছু সাব্যস্ত হইল না। ইতিমধ্যে একজন সাধু বলিলেন, "শুনিতেছি পোরবন্দর মহারাজের আলয়ে একজন বাঙ্গালী পরমহংস অবস্থান করিতেছেন। তিনি নাকি গড়গড় করিয়া ইংরাজী বলিতে পারেন ও একজন মস্ত পণ্ডিত। তা ছাড়া মহারাজের সঙ্গে তাঁর খুব খাতির আছে; আমি বলি কি, ত্রিগুণাতীতও বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এবং ইংরাজীও জানেন। তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া যাহাতে রাজাকে বলিয়া তিনি আমাদের কিছু অর্থ সাহায্য করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করুন।"

ত্রিগুণাতীত একটু ইতস্ততঃ করিয়া সন্ন্যাসীদের অনুরোধ-রক্ষায় সম্মত হইলেন এবং তৎপরদিন দ্বিপ্রহরের সময় ঐ সাধুদের মধ্যে একজনকে সঙ্গে লইয়া উক্ত বাঙ্গালী পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি তখন মোটেই বুঝিতে পারেন নাই যে, ঐ পরমহংস আর কেহ নহেন, তিনি তাঁহাদেরই নরেন্দ্রনাথ।

সামান্য সাধু দেখিয়া প্রথমে প্রহরিগণ প্রবেশ করিতেই দিল না। শেষে অনেক হাঙ্গামা করিয়া 'আমরা দুইজন সাধু উক্ত পরমহংসের সাক্ষাৎপ্রার্থী,' এই মর্ম্মে ইংরাজীতে একটু লিখিয়া সংবাদ দেওয়া হইল। স্বামিজী সেই সময়ে পাছে কোন পরিচিত ব্যক্তি বিশেষতঃ কোন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, এই ভয়ে যাহার তাহার সহিত দেখা করিতেন না। এই কারণে তিনি গাড়ীবারান্দার ছাদের উপর আসিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু সে সময় স্বামী ত্রিগুণাতীত গাড়ী বারান্দার ভিতর দিকে ছায়ায় দাঁড়াইয়াছিলেন, সুতরাং কাহাকেও না দেখিয়া একেবারে নীচে নামিয়া আসিলেন—আসিয়াই দেখেন সারদা দাঁড়াইয়া। স্বামী ত্রিগুণাতীতও পরমহংসের সাক্ষাৎলাভের উদ্দেশে আসিয়া

তাঁহাদেরই নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন স্বামিজী অপর সাধুটীকে বিদায় করিয়া দিয়া ইঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া রাত্রি ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত নানা কথাবার্ত্তা কহিলেন। কথায় কথায় বলিলেন, "ঠাকুর যে বল্‌তেন, এর ভিতর সব শক্তি আছে, ইচ্ছা করলে এ জগৎ মাতাতে পারে, একথা এখন কিছু কিছু বুঝতে পারছি।" স্বামী ত্রিগুণাতীত যখন বলিলেন,—"ভাই! আমি কতকগুলি সন্ন্যাসীর একান্ত অনুরোধে এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে এখানে এরূপ ভাবে রহিয়াছ, তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতাম না। উঁহারা হিঙ্গলাজতীর্থে যাইবেন বলিয়া রাজার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য চান, তা তুমি যদি এ বিষয়ে রাজাকে বলিয়া কিছু সাহায্য করিতে পার, এই জন্য আমাকে লইয়া উঁহাদের একজন এখানে আসিয়াছিলেন।" এই কথা শুনিয়া স্বামিজী বলিলেন, "ছি ছি, তুমি অর্থ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ? কেন ভিক্ষা করিবে কি জন্য? যদি কেহ স্বেচ্ছায় কিছু দেয় ভাল, নতুবা অর্থের জন্য পরের নিকট হাত পাতিবে! একি হীন বুদ্ধি! আর আমি বা তোমাদের হইয়া রাজাকে অনুরোধ করিতে যাইব কেন? তুমি জান, আমি কখনও কাহারও নিকট অর্থের জন্য হাত পাতি না। আজ রাজপ্রাসাদে আছি, কাল হয়ত দরিদ্রের কুটীরে গিয়া থাকিব। সন্ন্যাসীর তাতে কি আসে যায়? আর বাস্তবিকও আমি ২।৪ দিনের মধ্যেই আবার পথে পথে ঘুরিব। তোমরা সকলেই পরিব্রাজক, অদৃষ্টে যাহা ঘটিবে চুপ করিয়া সহ্য করিবে। যদি তোমার কাছে কিছু থাকে তাহা দিয়া দিতে পার।" যাহা হউক, স্বামিজীর নিকট বিদায় লইয়া পরদিন প্রত্যুষে ত্রিগুণাতীত স্বামী তাঁহার পুঁটলি-পাঁটলা বাঁধিতেছিলেন, উদ্দেশ্য অন্যস্থানে চলিয়া যাওয়া, এমন সময়ে সেই হাটকেশ্বর মন্দিরে স্বামিজী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও নিজে জোর করিয়া

পুঁটলি হাতে করিয়া লইয়া স্বামী ত্রিগুণাতীতকে নিজের নিকট লইয়া গেলেন ও তথায় দুইদিন রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় বলিলেন, "আমি যে এখানে রহিয়াছি, তাহা মঠে, বিশেষতঃ অখণ্ডানন্দের নিকট কোন মতে জানাইবে না।"

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই স্বামিজী মহারাজকে তাঁহার শীঘ্র ঐস্থান হইতে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্পের বিষয় জানাইতেই তিনি বলিলেন, এত শীঘ্র যাওয়া হইতে পারে না, তাঁহাকে আরও কিছুদিন তথায় থাকিতে হইবে। স্বামিজীর মনে হইল, বোধ হয় এখানে কিছুদিন যাপন করানতে ঈশ্বরের কোন অভিপ্রায় আছে, সুতরাং তিনি অগত্যা মহারাজের প্রস্তাবে সম্মতিদান করিয়া ঐখানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ও দিবারাত্র পাঠাদি মানসিক পরিশ্রমে রত হইলেন।

রাজসভায় এ সময়ে শঙ্কর পাণ্ডুরাং নামে একজন পণ্ডিতাগ্রগণ্য সভ্য বেদের অনুবাদ করিতেছিলেন। তিনিও স্বামিজীকে কিয়দ্দিন তাঁহার নিকট থাকিয়া উক্ত অনুবাদ-কার্য্যের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা উভয়ে কয়েক মাস ধরিয়া কঠিন পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, স্বামিজীও পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা বেদের মহিমা উত্তরোত্তর গভীরতর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার অধ্যয়ন ও মর্ম্মোদ্ঘাটনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্নশীল হইলেন। এখানে পূর্ব্বাবশিষ্ট পতঞ্জলির মহাভাষ্য পাঠও সমাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহের কূট বিষয়গুলি আয়ত্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। পণ্ডিতজীর সাহায্যে ফরাসী ভাষায় প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে মোটামুটী ঐ ভাষায় অধিকার লাভ করিলেন। পণ্ডিতজী বলিলেন, "স্বামিজী, দেখিবেন ভবিষ্যতে উহা আপনার কাজে আসিবে।"

বেদানুবাদকালে পণ্ডিতজী স্বামিজীর অদ্ভুত ধীশক্তি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সবিশেষ পরিচয় পাইয়া একদিন তাঁহাকে বলিলেন,—"স্বামিজী, আমার মনে হয় যে, আপনি এদেশে বেশী কিছু করিতে পারিবেন না। কারণ এদেশে আপনার শক্তির যথাযোগ্য পরিমাণ নির্দ্ধারণে সমর্থ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আপনার উচিত একবার ইউরোপাদিদেশে গমন করা। সেখানকার লোকে আপনার মর্য্যাদা বুঝিবে এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাস আপনি তাহাদের মধ্যে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতার উপর নূতন আলোকরশ্মিপাত করিতে পারিবেন।" স্বামিজী চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার নিজের মনেও কিছুদিন হইতে ঐরূপ একটা চিন্তার ক্ষীণাভাস উঠিতেছিল, পণ্ডিতজীর কথার সহিত তাহার ঐক্য দেখিয়া তিনি যেন একটু সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না। এমন কি জুনাগড়ে অবস্থানকালে C. H. Pandya মহোদয়ের নিকটও তিনি একদিন পাশ্চাত্যদেশে যাইবার ইচ্ছা কথায় কথায় একটু প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে একটা অস্থায়ী কল্পনার মত মনে উদয় হইয়াই অদৃশ্য হইয়াছিল, কারণ তখন ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

এই সময়টা স্বামিজীর মনে প্রবল অস্থিরতার উদয় হইয়াছিল। পূর্ব্বেই আমরা ত্রিগুণাতীত স্বামীর প্রসঙ্গেও তিনি যে নিজের ভিতর একটা প্রবল শক্তির বিকাশ অনুভব করিতেছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। প্রকৃতই তাঁহার মধ্যে এরূপ একটা শক্তির উন্মেষ সে সময়ে শুধু তিনি নিজে নহে, পোরবন্দর রাজসভার প্রত্যেক পণ্ডিত ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শঙ্কর পাণ্ডুরাংএর মতের সমর্থন করিয়া বলিলেন, "সত্যই স্বামিজী, ভারত আপনার উপযুক্ত স্থান নহে। আপনি পাশ্চাত্যদেশে গমন করুন এবং

একবার সে দেশে আগুন জ্বালিয়া আসুন—দেখিবেন, এদেশের লোক আপনার প্রত্যেক কথায় উঠিতেছে বসিতেছে।” এ সময়ে তিনি যে যে স্থানে ভ্রমণ ও যে যে রাজা, রাজপুরুষ বা শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার মধ্যে দেশের জন্য একটা কিছু করিবার জন্য প্রবল ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার অন্তরের গভীরতার সীমানির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেন, তিনি প্রবল চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছেন। বস্তুতঃ তখন তাঁহার মনে কি করিয়া ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়, ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় চিন্তা ছিল না। তিনি পুরাতনপন্থী-দিগের অন্ধতা ও আধুনিক সংস্কারকদিগের অপরিণামদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা আপনাদিগকে জন-সাধারণের নেতা বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদের অনেকের কপটতা ও মূঢ়াচার এবং সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র দ্বেষহিংসা, স্বার্থানুসন্ধান ও একতার অভাব অবলোকন করিয়া মনে মনে বিশেষ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, ভারতের মধ্যে গগনস্পর্শী গৌরব ও মহত্ত্বের বীজ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে এবং আর্য্য-সভ্যতার অতুলনীয় সম্পদ্‌রাশি দেশমাতার পদতলে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে পতিত রহিয়াছে; কিন্তু পাশ্চাত্য-সভ্যতার মোহপঙ্কে নিপতিত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য নির্ম্মম সংস্কারকের করাল কুঠার ও কূপমণ্ডুকের ন্যায় আত্মগর্ব্বস্ফীত রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অন্ধতা ও বধিরতা—এই উভয় বিপদ্ মিলিত হইয়া দিনদিন দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। তিনি দেখিলেন, এই উভয় বিপদ্ হইতে দেশকে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। সেই জন্য তিনি যে সকল ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতেন ও ভালবাসিতেন,

তাহাদের সকলকেই বলিয়াছিলেন যে, একটা নূতন যুগ আসিতেছে—তাহাতে পুরাতনের অনেক পরিবর্ত্তন হইবে বটে, কিন্তু আমূল ধ্বংস হইবে না, অথচ জগতের চতুর্দ্দিক্ হইতে একটা নূতন আশা, নূতন আশঙ্কা ও নবতর রশ্মি এই প্রাচীনদেশে আসিয়া পড়িবে। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমানে কেবল ধ্যান-ধারণা সমাধি বা তপস্যায় নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা, এই দরিদ্র পতিত অবস্থায় দেশকে উদ্ধার ও উন্নত করা অধিকতর আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয় এবং সমগ্র ধর্ম্মকে জাগ্রত ও পুনর্জ্জীবিত করাই এখনকার শ্রেষ্ঠ কার্য্য। দেশীয় নরপতিবৃন্দ ও প্রধান প্রধান রাজ-অমাত্যদিগকে তিনি এই কথাই বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও সেই আত্মসাক্ষাৎলব্ধ মহাপুরুষের হৃদয়োত্থ গম্ভীর কল্যাণ-নির্ঘোষ অবনত মস্তকে শ্রবণ করিয়াছিলেন। স্বামিজী অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তখন অনুভব করিতে লাগিলেন যে, জগতের চক্ষে ভারতকে আবার উন্নত করিতে হইলে প্রথমে একবার পাশ্চাত্য দেশে গিয়া ভারতের গৌরবের দিনের সংবাদটা শুনাইতে হইবে, ভারতের ধর্ম্ম-দর্শনের মধ্যে যে অনন্ত আশার বাণী ধ্বনিত হইতেছে, তাহা সেই বিলাস-বাত্যাবিক্ষুব্ধ ভোগনিপীড়িত বলমদদৃপ্ত পাশ্চাত্য বীরজাতিদিগের নিকট বহন করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাই আজি পোরবন্দরবাসী পণ্ডিতদিগের কথা তাঁহার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে সবলে আঘাত করিতে লাগিল ও প্রতি আঘাতে হৃদয়সমুদ্রের চতুষ্কোণ হইতে অগণন ভাব-তরঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি যতই অভিনিবেশ সহকারে বেদপাঠ করিতে লাগিলেন, যতই আর্য্যঋষিদিগের প্রচারিত দর্শনাদি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন, সত্যই ভারত জগতের বরেণ্যা ধর্ম্মজননী, আধ্যাত্মিকতার মূল উৎস ও মানব-সভ্যতার

আদি জন্মভূমি। কিন্তু ভারতের এই গৌরব-মহিমা যে অজ্ঞতার অন্ধকারময় স্তূপের নিম্নে চিরপ্রোথিত হইয়া রহিল, কোটী কোটী ভারত-সন্তান তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না, এইটাই তাঁহার বিশেষ মনঃকষ্টের কারণ হইল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, জলস্রোতে জীর্ণ অট্টালিকার ন্যায় শতাব্দীব্যাপী বৈদেশিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রবল আক্রমণে ধ্বংসোন্মুখ আর্য্যসভ্যতা আর তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, আর যাঁহারা সেই সভ্যতার কর্ণধার, শিক্ষার ন্যাসপাত্র ও গৌরবের রক্ষক সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বা পুরোহিতগণের অনেকেই কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ, ধর্ম্মপালনে উদাসীন, আচার-ব্যবহারে অসংযত, এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ। শুধু ফনোগ্রাফ যন্ত্রের ন্যায় ব্যাকরণ ও দর্শনের গুটিকতক বাঁধা বুলি আওড়াইয়াই আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিতেছেন —সদসদ্ বিচার দ্বারা পুরাতনের পঙ্কোদ্ধার করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা বা জাতীয়তার বৃদ্ধি কোনদিকেই অগ্রসর নহেন। এই সকল বিষয়ে স্বামিজী যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। "আমি কি করিতে পারি", "আমার দ্বারা কি হওয়া সম্ভব?" পুনঃপুনঃ এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি সময়ে সময়ে হতাশ হইয়া পড়িতেন, কিন্তু তথাপি ঐ চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

যাহা হউক, অবশেষে একদিন তিনি পোরবন্দর-বাসীদিগের মায়া কাটাইয়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশে সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকাধামে উপনীত হইলেন। দ্বারকার আজি আর সেদিন নাই—যে স্থানে একদিন অতীত ভারতের হৃদয়দেবতা পুণ্যস্মৃতি শ্রীকৃষ্ণ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং যাহা সতত প্রবলপরাক্রান্ত যাদববীরগণের পদভরে কম্পিত হইত, আজি সেথায় মহাসাগরের নীল জলরাশি সকৌতুকে ক্রীড়া করিতেছে! হায় সে প্রাচীন দিন!

দ্বারকায় আসিয়া স্বামিজী আবার পূর্ব্ববৎ পরিব্রাজকের স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কখনও গভীর ধ্যানে থাকিতেন, কখনও অতীতের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিতেন, কখনও নিরাশার বিভীষিকায় তাঁহার বেদনা-কাতর হৃদয় ভূগর্ভের তিমিরপুঞ্জের মধ্যে ডুবিয়া যাইত, কখনও বা আশার উজ্জ্বল আলোকে আনন্দলহরী তালে তালে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করিত। তিনি আশা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেন না এবং ইষ্টদেবতার নিকট মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করিতেও বিরত ছিলেন না। তিনি অকূল বারিধির কূলে বসিয়া উদ্দাম স্রোতোবেগ নিরীক্ষণ করিতেন আর ভাবিতেন— বৈদেশিক সভ্যতার প্রচণ্ড স্রোত কি করিয়া বন্ধ করা যায়। এইভাবে নীল-সিন্ধুজলের অপর পারে চাহিয়া চাহিয়া উদাসভাবে কুজ্ঝটিকাবৃত ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, তাহা চিন্তা করিতে করিতে সময় সময় আত্মহারা হইয়া যাইতেন।

দ্বারকায় তিনি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত সারদামঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোহান্তজী তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার বাসের জন্য একটি নির্জ্জন কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া তিনি ভাবিতেন—এক সময়ে এই মঠ কিরূপ বিদ্যালোচনার স্থান ছিল, এখানে যুগে যুগে কত সাধু সন্ন্যাসী, কত যতি ও কত পণ্ডিতের চরণধূলি পতিত হইয়াছে, আর আজি ইহার কি দশা! ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ভাবোদ্বেলহৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত এবং উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলে নয়নদ্বয় প্লাবিত হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া শুধু কাঁদিতেন না—কিসে এ দুর্দ্দশা মোচন হইতে পারে, অহঃরহ তাহার চিন্তা করিতেন। সে চিন্তার আদি অন্ত ছিল না—সে দিক্‌হীন, কূলহীন চিন্তাসাগরে তিনি যেন একখানি

কাণ্ডারীহীন তরণীর ন্যায় লক্ষ্যহারা হইয়া ভাসিয়া চলিতেন। কিন্তু একদিন কূল মিলিল—সারদামঠের নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া তিনি যেন অন্ধকারের মধ্যে ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাইলেন।

দ্বারকা ত্যাগ করিয়া স্বামিজী মাণ্ডবী গমন করিলেন। সেখানে অনেক ভক্তবন্ধুর শ্রদ্ধা-ভালবাসা আকর্ষণ করিয়া প্রথমে নারায়ণ সরোবর নামক তীর্থে ও পরে আশাপুরী, কোটীঘর প্রভৃতি হইয়া পুনরায় মাণ্ডবীতে প্রত্যাগত হইলেন। সব স্থানেই পূর্ব্ববৎ যত্রতত্র শয়ন, ভিক্ষামাত্র সম্বল ও ইষ্টদেবতার চিন্তারত হইয়া স্বেচ্ছাবিহারী সিংহের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

মাণ্ডবীতে অখণ্ডানন্দ স্বামী পুনরায় স্বামিজীর সহিত দেখা করেন। তিনি তখন অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়া মনে করিতেন, স্বামিজী তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন, তাই সুযোগ পাইলেই তাঁহার সহিত দেখা করিতেন। এবারও উভয়ে এক বৃদ্ধা শেঠীর গৃহে আট দিন ছিলেন। শেষে অখণ্ডানন্দ, স্বামিজীকে ছাড়িতে না চাওয়ায় স্বামিজী তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বিদায় করেন। মাণ্ডবী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি ভুজরাজ ও তাঁহার দেওয়ানের আমন্ত্রণে আর একবার ভুজরাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেখান হইতে বহুক্রোশ ভ্রমণ করিয়া পলিটানা নামক প্রাচীন স্থানে শত্রুঞ্জয় নামক পবিত্র জৈনমন্দির দর্শন করিলেন। শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের উপরে হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি হনুমান্‌জীর মন্দির ও হেন্‌গার নামক কোন মুসলমান পীরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটি মুসলমান দেবালয় আছে। পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশ হইতে চতুর্দ্দিক্‌কার দৃশ্য অতি মনোহর দেখায়। নিম্নে বহুদূরপ্রসারী সমতলক্ষেত্র, পূর্ব্বে কাম্বে উপসাগর ও উত্তরে চামর্দ্দীশিখর-শোভিত শিহোরের শৈলমালা—সে দৃশ্য অতি সুন্দর। এই বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডের

মধ্যে কত জাতি উদিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে, কে তাহাদের কথা মনে করে! অদূরে পশ্চিম ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী প্রাচীন বল্লভীপুর নগর—যাহা রোমনগরী অপেক্ষাও প্রাচীন—আজি তাহার সে গৌরব কোথায়!

শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া স্বামিজী পলিটানার অন্তর্গত শতশত মন্দির দর্শন করিতে করিতে গমন করিলেন। প্রভাস ও পলিটানায় সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি রটিয়াছিল। অনন্তর তিনি বরোদার গায়কবাড়ের রাজধানীতে ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান বাহাদুর মণিভাইয়ের বাটীতে অল্পকালের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মধ্য-ভারতের অন্তর্গত খাণ্ডোয়া সহরে উপনীত হইলেন, এবং ভ্রমণ করিতে করিতে বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় নামক একজন উকীলের বাটীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। কাছারী হইতে বাটী ফিরিয়া হরিদাসবাবু দেখিলেন, দ্বারদেশে একজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। প্রথম দর্শনে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, একজন সাধারণ সন্ন্যাসী হইবে, কিন্তু দু'চারিটী কথা কহিয়াই বুঝিলেন যে, এতবড় পণ্ডিতসাধু আর কখনও তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। সুতরাং তিনি তাঁহাকে নিজগৃহে আহ্বান করিলেন এবং বাটীর সকলে নিকট-আত্মীয়ের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি তিন সপ্তাহ রহিলেন, মধ্যে একবার ইলোর ভ্রমণে গিয়াছিলেন।

খাণ্ডোয়ারে বাঙ্গালী সম্প্রদায় ও অন্যান্য লোকেরা স্বামিজীর সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার অদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞান ও ইংরাজী সাহিত্যে অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

হরিদাসবাবু স্বামিজীকে সাধারণের সম্মুখে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রথমে স্বামিজী বলিলেন যে, সাধারণ্যে বক্তৃতা দেওয়া অপেক্ষা পূর্ব্বে গুরুশিষ্যের মধ্যে যেরূপভাবে কথোপ-

কথন হইত, সেই ভাবে পরস্পর সম্মুখে বসিয়া কোন বিষয় আলোচনা করা ভাল, কেন না ইহাতে আলোচ্য বিষয়টিও সুপরিস্ফুট হয় আর বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে বেশ ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটে। কিন্তু তথাপি হরিদাসবাবু আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিতে থাকিলে তিনি অর্দ্ধসম্মত হইয়া বলিলেন যে, সাধারণ্যে বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার কখনও অভ্যাস না থাকাতে কি করিয়া স্বরের উচ্চাবচ আয়ত্তাধীন করিতে হয়, সে অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই, তবে যদি অনেকগুলি শ্রদ্ধাসম্পন্ন অনুরাগী শ্রোতা আসিয়া জুটে, তবে তাহাদের সহানুভূতিতে উৎসাহিত হইয়া তিনি দু'চার কথা বলিতে পারেন। কারণ অনুরাগী শ্রোতা পাইলে বক্তার অন্তর্নিহিত বক্তৃতাশক্তি আপনিই ফুটিয়া বাহির হয়। কিন্তু খাণ্ডোয়ার ন্যায় সামান্য স্থানে এরূপ শ্রোতার অভাব হওয়ায় হরিদাস বাবুর ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। খাণ্ডোয়ায় অবস্থান কালে দেওয়ানী আদালতের জজ বাবু মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামিজীর সম্মানার্থ স্থানীয় বাঙ্গালীদিগকে একদিন ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে সময়টা বেশ আনন্দে ও শিক্ষায় কাটিবে এই ভাবিয়া স্বামিজী উপনিষৎ গ্রন্থাবলীর একখণ্ড হাতে লইয়া নিমন্ত্রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। সভাস্থ সকলে সমবেত হইলে তিনি কতকগুলি কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য স্থান আবৃত্তি করিয়া অতি সরল শিশু-ধারণোপযোগী ভাষায় তাহাদের ব্যাখ্যা করিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাবু পিয়ারীলাল গাঙ্গুলী নামে একজন উকীল ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল, সুতরাং সভায় তিনিই সমালোচকের স্থান অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী যে সকল অপূর্ব্ব সরল ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে তিনি অবশেষে নিরুত্তর হইতে বাধ্য হইলেন। স্বামিজীর পাঠ সমাপ্ত হইলে পিয়ারীবাবু

হরিদাস বাবুর কাণে কাণে বলিলেন, "স্বামিজীকে দেখিয়াই মনে হয় ইনি ভবিষ্যতে একজন জগৎপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবেন।"

খাণ্ডোয়াতেই প্রথম স্বামিজীর মনে চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভায় যাইবার সঙ্কল্প স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। জুনাগড় ও পোরবন্দরে যে চিন্তার অঙ্কুরমাত্র হইয়াছিল, এখানে তাহা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। তিনি একদিন হরিদাস বাবুকে বলিলেন, "যদি কেউ আমার যাতায়াতের খরচ দেয়, তা হলে আমি যাইতে পারি।" খাণ্ডোয়া ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে হরিদাসবাবু স্বামিজীকে আরও কিছুদিন ধরিয়া রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজী বলিলেন, "তোমারা সবাই এত যত্ন করিতেছ যে, তোমাদের ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু আমার থাকিবার যো নাই। আমি তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছি—রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে। যদি আমি এই ভাবে প্রত্যেক স্থানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করি, তাহা হইলে আর আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না।" হরিদাসবাবু যখন দেখিলেন, স্বামিজী নিশ্চয়ই তাঁহাদের ছাড়িয়া যাইবেন, তখন তিনি তাঁহার বোম্বাই-প্রবাসী এক সহোদরের উপর একখানি পরিচয়-পত্র তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "আমার ভ্রাতা আপনাকে মিঃ ছাবিলদাসের সহিত পরিচিত করিয়া দিবেন। বোধ হয় তিনি আপনাকে বিশেষ সাহায্য করিতে সমর্থ হইবেন। বাস্তবিক স্বামিজী আপনার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল।"—স্বামিজী উত্তর করিলেন, "বলিতে পারি না, কিন্তু গুরুজী ত আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতেন।" এইরূপে খাণ্ডোয়ারে বহু ভক্ত ও বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি বোম্বাই যাত্রা করিলেন। হরিদাসবাবু তাঁহাকে একখানি টিকিট কিনিয়া দিয়া রেলে যাইতে অনুরোধ করেন। স্বামিজী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ইষ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামিজী বোম্বাই সহরে পদার্পণ করিলেন। এখানে হরিদাসবাবুর ভ্রাতার সাহায্যে প্রখ্যাত-নামা ব্যারিষ্টার রামদাস ছিবলদাসের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। তিনি রামদাসবাবুর অনুরোধে তাঁহারই গৃহে কিছুদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং এখানেও অধিকাংশকাল বেদচর্চ্চা লইয়া রহিলেন। দৈবক্রমে একদিন অভেদানন্দ স্বামীর সহিত দেখা হয়। তিনি বলেন, "এ সময়ে স্বামিজীর হৃদয়টা যেন অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় হইয়া-ছিল। আর কোন চিন্তা নাই, কেবল কি করিয়া ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়, অহর্নিশ ইহাই ভাবিতেন।" স্বামিজীর চিত্তের উৎকণ্ঠা দেখিয়া অভেদানন্দ ভীত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, "তখন স্বামিজীকে দেখিলেই একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত বলিয়া মনে হইত।" স্বামিজী নিজেও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'কালী, আমার ভেতর এতটা শক্তি জমেছে যে ভয় হয় পাছে ফেটে যাই।'

কয়েক সপ্তাহ বোম্বাইয়ে থাকিয়া তিনি পুনায় গমন করিলেন। স্বামিজী দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যাইতেছিলেন। সেই গাড়ীতে বাল-গঙ্গাধর তিলক ও আর কয়েকজন ভদ্রলোক ছিলেন। স্বামিজীকে দেখিয়া ঐ ভদ্রলোকেরা ইংরাজীভাষায় পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীদের দ্বারাই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, স্বামিজী ইংরাজী জানেন না, সেই জন্য খুব স্বাধীনভাবে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করিতেছিলেন, আর তিলক সন্ন্যাসীদের পক্ষ হইয়া তাঁহার সম্মান করিতেছিলেন। স্বামিজী প্রথমটা চুপ করিয়া

ইঁহাদের বাদ-প্রতিবাদ শুনিতেছিলেন, শেষে ইঁহাদের কথায় যখন যোগ দিলেন, তখন সকলে স্বামিজীর অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তিলক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পুনায় নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া এক মাস রাখিলেন।

এই প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত বহুবিষয়ে আলাপ করিয়া স্বামিজী বিশেষ তৃপ্তি বোধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে লিমড়ীরাজ মহাবাণেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন শ্রবণ করিয়া স্বামিজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহারাজ পুনরায় গুরুর দর্শনলাভে প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ চিরস্থায়িভাবে লিমড়ীতে বসবাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু স্বামিজী বলিলেন,—'মহারাজ এখন নহে, এখন আমার কাজ আছে। সেই কাজে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। যতদিন না কার্য্য শেষ হয়, ততদিন আমার বিশ্রাম নাই। তবে যদি কখন বিশ্রামের সময় থাকে, নিশ্চয় জানিবেন, আপনার ওখানে গিয়া থাকিব।'

অতঃপর স্বামিজী বেলগাঁওয়ে গেলেন এবং সাবডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসার বাবু হরিপদ মিত্রের বাড়ীতে নয় দিবস যাপন করিয়াছিলেন। হরিপদবাবুর সহিত সাক্ষাতের বিবরণ আমরা যতদূর সম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় দিলাম।

"১৮৯২ সালের ১৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার। প্রায় দুই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। আমার একজন উকীল বন্ধু একটি পুষ্টদেহ প্রফুল্লকান্তি বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে লইয়া আমার বাসায় উপস্থিত। বলিলেন,—'ইনি একজন বিদ্বান্ বাঙ্গালী সন্ন্যাসী আপনার সহিত সাক্ষাৎ মানসে আসিয়াছেন।' সন্ন্যাসী ঠাকুরের মূর্ত্তিটি বেশ প্রশান্ত, চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে, অঙ্গে আলখাল্লা, মাথায় গেরুয়া

পাগড়ী এবং পায়ে মহারাষ্ট্রদেশীয় চটিজুতা। সে অপরূপ মূর্ত্তি স্মরণ হইলে এখনও যেন চক্ষুর সামনে দেখি। দেখিয়া আনন্দ হইল— তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম। কিন্তু তখন উহার কারণ জানিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,— "মহাশয় কি তামাক খান? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন হুঁকা নাই, আপনার যদি আমার হুঁকায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।" তিনি বলিলেন,— "তামাক চুরুট যখন যাহা পাই, তখন তাহাই খাইয়া থাকি। আর আপনার হুঁকায় খাইতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই।" তামাক সাজাইয়া দিলাম। তখন আমার বিশ্বাস গেরুয়াবেশধারী সন্ন্যাসী মাত্রেই জুয়া-চোর। ভাবিলাম, ইনিও সম্ভবতঃ কিছু প্রত্যাশা করিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন, কিম্বা উক্ত মারহাট্টি বন্ধুর বাটীতে থাকিবার অসুবিধা হইতেছে বলিয়া বোধ হয় আমার বাটীতে থাকিবার মতলব। মনে এইরূপ নানা তোলাপাড়া করিয়া তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাঁহার জিনিষপত্র আমার বাসায় আনাইব কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,—'আমি উকীলবাবুর বাসায় বেশ আছি। আর বাঙ্গালী দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার মনে দুঃখ হইবে। কারণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ভক্তি করিতে-ছেন, অতএব আসিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।' সে রাত্রে বড় বেশী কথা-বার্ত্তা হইল না। কিন্তু দুই চারি কথা যাহা কহিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমা অপেক্ষা হাজার গুণে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্, ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকাকড়ি স্পর্শ করেন না ও সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও সহস্রগুণে সুখী। বোধ হইল তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, কারণ

স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছা নাই। আমার বাসায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম,—'যদি চা খাইবার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আসিলে সুখী হইব। তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন ও উকীলটির সহিত তাঁহার বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ভাবিলাম। মনে হইল এমন নিস্পৃহ, চিরসুখী, সদাসন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ ত কখন দেখি নাই। মনে করিতাম, 'যাহার পয়সা নাই, তাহার মরণ ভাল', 'বাস্তবিক নিস্পৃহ সন্ন্যাসী জগতে অসম্ভব।' কিন্তু সে বিশ্বাসে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া এতদিনে তাহাকে শিথিল করিয়া ফেলিল।"

পর দিবস ভোর ছটার সময় উঠিয়া হরিপদবাবু অনেকক্ষণ স্বামিজীর পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেলা ৮টা বাজিয়া গেলেও যখন তাঁহার দর্শন পাইলেন না, তখন তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকটীর গৃহে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে এক বৃহৎ সভা হইয়াছে, তাহাতে অনেক প্রধান প্রধান উকীল, পণ্ডিত ও স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি সমবেত হইয়া স্বামিজীকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন ও খুব কথা-বার্ত্তা চলিতেছে। স্বামিজী কাহাকেও ইংরাজীতে, কাহাকেও সংস্কৃতে, এবং কাহাকেও হিন্দুস্থানীতে প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। সেজন্য তাঁহাকে একবার একটুও চিন্তা করিতে হইতেছে না। এক ভদ্রলোক হাক্সলীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে যাবতীয় জ্ঞান নিহিত আছে মনে করিয়া সেই সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া স্বামিজীকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামিজীর নিকট সে সব কতক্ষণ টিকিবে? তিনি বহু পূর্ব্বেই হাক্সলীর গ্রন্থাবলী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। সুতরাং কখন গম্ভীর যুক্তিতে, কখন বিদ্রূপের তীব্র কসাঘাতে, কখনও

বা আপনার আধ্যাত্মিক তেজঃপ্রভাবে সহজেই প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করিলেন। মিত্রজা স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, 'ইনি কি মনুষ্য না দেবতা ?'

নয়টার পর যাঁহাদের অফিস বা কোর্ট ছিল, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। কেহ বা তখনও বসিয়া রহিলেন। স্বামিজীর দৃষ্টি হরিপদবাবুর উপর পড়ায় চা খাইতে যাইবার কথা মনে পড়িল। বলিলেন, 'বাবা, অনেক লোকের মন ক্ষুণ্ণ করিয়া যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও না।' মিত্রজা পুনরায় স্বামিজীকে তাঁহার গৃহে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে স্বামিজী বলিলেন,—'আমি যাঁহার বাটীতে আছি, তাঁহার মত করিতে পারিলে যাইতে পারি।' অনেক চেষ্টার পর গৃহবাসী হরিপদবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন স্বামিজীর সঙ্গে ফরাসীসঙ্গীত সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক, একটি কমণ্ডলু ও একখানি মাত্র গেরুয়া বস্ত্র ছিল।

হরিপদবাবুর বাটীতে সহরের অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক স্বামিজীকে দর্শন করিতে যাইতেন। ক্রমাগত ধর্ম্মালোচনা, বিচার ও প্রশ্নোত্তরে তিন দিবস কাটিয়া গেল এবং এই অল্পকালের মধ্যেই হরিপদবাবুর মনের দীর্ঘকালসঞ্চিত সন্দেহরাশি দূর হইল। চতুর্থ দিবসে স্বামিজী বলিলেন, 'আর নহে, এবার যাইতে হইবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে সহরে তিনদিন ও গ্রামে একদিনের অধিক থাকা বিধি নহে। বেশীদিন থাকিলেই আসক্তি জন্মায়। সন্ন্যাসী মায়াপাশ হইতে যথাসাধ্য দূরে দূরে থাকিবে।' কিন্তু মিত্রজা তাঁহাকে এত শীঘ্র বিদায় দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার একান্ত অনুরোধে স্বামিজী আরও কয়েক দিবস ওখানে রহিলেন।

সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে বিবেচনা করিয়া হরিপদবাবু স্বামিজীকে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া বক্তৃতা দিতে বলিলেন, কিন্তু স্বামিজী তাহাতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, 'না, উহাতে নাম-যশের আকাজ্ক্ষা আসিতে পারে। ওটা আমি পছন্দ করি না। আর তা ছাড়া ওরূপ্ বৃহৎ সভা করিয়া বক্তৃতা দেওয়া অপেক্ষা সাম্‌না সাম্‌নি বসিয়া প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ভাল।'

একদিন স্বামিজী অর্থস্পর্শ না করিয়া দেশভ্রমণে কত জায়গায় কত কি ঘটনা হইয়াছিল, তাহা হরিপদবাবুর নিকট বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কোথাও তিন দিন উপবাসের পর নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় একজন এরূপ ভীষণ ঝাল তরকারী খাইতে দিল যে, তাহা রসনায় পড়িবামাত্র উদর পর্য্যন্ত ভয়ানক জ্বলিতে লাগিল, অবশেষে বাটী বাটী তেঁতুল গোলা খাইয়াও সে জ্বালা থামাইতে পারেন না! আর এক জায়গায় একবার ভিক্ষা চাহিবামাত্র গৃহস্থ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গালি দিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, বলিয়াছিল, 'এখানে-চোর ছেঁচড় সাধু ফকির জোচ্চোর এ সবের যায়গা হবে না।' আবার অনেক দিন ধরিয়া তিনি কিরূপ ডিটেকটিভ পুলিশের নজরে নজরে থাকিতেন, তাহাও বলিলেন। হরিপদবাবু তাঁহার প্রবাস-ভ্রমণের ক্লেশকাহিনী শ্রবণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আহা, ইনি কতই কষ্ট কতই উৎপাত সহ্য করিয়াছেন!' কিন্তু স্বামিজী সে সব যেন কত মজার কথা এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেলেন। শেষে বলিলেন, 'সবই মহা-মায়ার খেলা।'

স্বামিজীর অদ্ভুত স্বদেশপ্রেম ও দরিদ্রদিগের প্রতি সহানুভূতির উল্লেখ করিয়া হরিপদবাবু লিখিয়াছেন, "একদিনের কথা—কলিকাতা সহরে এক ব্যক্তি অনাহারে মারা গেছে, খবরের কাগজে একথা পড়িয়া

স্বামিজীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, বলিবার কথা নহে। বারবার বলিতে লাগিলেন, 'এইবার বা দেশটা উৎসন্ন যায়!' কেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'এদেশে চিরদিন ভিখারীর জন্য মুষ্টিভিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। যতই গরীব হউক না কেন ভিক্ষা করিয়া দুবেলা দুমুঠা পায়। দুর্ভিক্ষ না হইলে একেবারে না খাইয়া মরে না। কিন্তু এই আমি প্রথম শুনিলাম কলিকাতার মত জনপূর্ণ সহরে একটা লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।' ইংরাজী শিক্ষার কৃপায় আমি তখন দুই চারি পয়সা ভিক্ষুককে দান করাটা অপব্যয় মনে করিতাম। সুতরাং বলিলাম, 'স্বামিজী, ভিখারীদের যৎসামান্য কিছু দেওয়াতে কি অর্থের সদ্ব্যবহার হয়? আমার ত বোধ হয় উহাতে তাহাদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হইয়া থাকে, কারণ বিনা পরিশ্রমে পয়সা পাইয়া তাহারা গাঁজা গুলি খায় ও আরও অধঃপাতে যায়; লাভের মধ্যে দাতার কিছু মিছে খরচ বাড়িয়া যায়।' স্বামিজী বলিলেন, 'যদি অবস্থায় কুলায় তবে ভিখারীকে যাহা হয় কিছু দেওয়া উচিত। দেবে ত ২।১টি পয়সা, তাই নিয়ে কে কি করে না করে সে জন্য তোমার মাথা ঘামাইবার অত দরকার কি? যদি তাহার প্রকৃতই অভাব হয় আর তোমার নিকট সে কিছু না পায়, তবে সে নিশ্চয়ই চুরি করিতে বাধ্য হইবে। ইহাতে আরও বেশী অনিষ্ট হইবে। কারণ গাঁজা গুলিতে শুধু তাহার নিজেরই ক্ষতি, কিন্তু চুরি করিলে সমস্ত সমাজের ক্ষতি। এদেশে ভিখারী চিরদিনই ভগবানের নামে ভিক্ষা করে। দাতারও উচিত ভিখারীকে নারায়ণজ্ঞানে ভিক্ষা দেওয়া, কারণ সে দানরূপ কর্ম্মদ্বারা তোমার চিত্তশুদ্ধি সাধনের সহায়তা করিতেছে। তুমি যাহা দিতেছ, তাহার বদলে যাহা পাইতেছ, তাহার মূল্য অনেক অধিক।"

আর একদিন হরিপদবাবু বলিলেন, "স্বামিজী! আপনার আজ তর্ক-বিতর্কে অনেক কষ্ট হইয়াছে।" তিনি বলিলেন, "বাবা, তোমরা যেরূপ utilitarian তাহাতে যদি আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা কি আমাকে এক মুঠা খাইতে দাও? আমি এইরূপ গল্ গল্ করিয়া বকি, লোকের শুনে আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেন, যে সকল লোক সভায় তর্ক-বিতর্ক করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহারা বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছায় ওরূপ করে না। আমিও বুঝিতে পারি, কে কি ভাবে কি কথা বল্‌লে ও তাহাকে সেইরূপ উত্তর দিই।" হরিপদবাবু বলিলেন, "ভাল স্বামিজী! সকল প্রশ্নের অমন চোখা চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কিরূপে?" তিনি বলিলেন, "ঐ সকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নূতন, কিন্তু আমাকে কত লোকে কতবার ঐ প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করেছে, আর তাহার কতবার উত্তর দিয়েছি।" হরিপদবাবু বলিলেন, "আচ্ছা স্বামিজী! তা'হলে দেখিতেছি, ধর্ম্ম ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে অনেক লেখাপড়া জানা আবশ্যক।" স্বামিজী উত্তর করিলেন, "নিজে ধর্ম্ম বোঝ্‌বার জন্য লেখাপড়া আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে হইলে উহার বিশেষ আবশ্যক। পরমহংস রামকৃষ্ণ-দেব 'রামকেষ্ট' বলিয়া সহি করিতেন, কিন্তু ধর্ম্মের সারতত্ত্ব তাঁর চেয়ে কে বুঝেছিল।"

হরিপদবাবুর বিশ্বাস ছিল সাধু সন্ন্যাসীর স্থূলকায় ও সদা সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া অসম্ভব। একদিন হাসিতে হাসিতে স্বামিজীর দিকে কটাক্ষ করিয়া ওকথা বলায় তিনিও বিদ্রূপচ্ছলে উত্তর করিলেন "ইহাই আমার Famine Insurance Fund. যদি পাঁচ সাতদিন খাইতে না পাই, তবু এই চর্ব্বিগুলা আমায় বাঁচাইয়া রাখিবে, কিন্তু তোমরা একদিন না খাইলেই সব অন্ধকার দেখিবে। আর যে ধর্ম্মে মানুষকে সুখী করে না,

তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে, dyspepsia প্রসূত রোগ বিশেষ বলিয়া জানিও। ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সুখী করা। পরজন্মে সুখী হইব বলিয়া ইহজন্মে দুঃখভোগ করাও বুদ্ধিমানের কাজ নহে। এই জন্মে এই মুহূর্ত্ত হইতেই সুখী হইতে হইবে, যে ধর্ম্ম দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইবে, তাহাই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ ক্ষণস্থায়ী ও তাহার সহিত অবশ্যম্ভাবী দুঃখও অনিবার্য্য। শিশু, অজ্ঞানী ও পশুপ্রকৃতির লোকেরাই ঐ ক্ষণস্থায়ী দুঃখমিশ্রিত সুখকে বাস্তবিক সুখ মনে করিয়া থাকে। যদি ঐ সুখকেও কেহ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া চিরকাল সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ও সুখী থাকিতে পারে, তাহাও মন্দ নহে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত এরূপ লোক দেখা যায় নাই। সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে, যাহারা ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাকেই সুখ মনে করে, তাহারা আপনাদের অপেক্ষা ধনবান্, বিলাসী লোকদের অধিক সুখী মনে করিয়া দ্বেষ করিয়া থাকে এবং তাহাদের বহুব্যয়সাধ্য উচ্চশ্রেণীর ইন্দ্রিয়-ভোগ দেখিয়া উহা পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া অসুখী হইয়া থাকে। সম্রাট আলেকজাণ্ডার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া পৃথিবীতে আর জয় করিবার দেশ নাই ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ মনীষীরা অনেক দেখিয়া-শুনিয়া ভোগ-বিচার করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন একটা ধর্ম্মে যদি পূর্ণবিশ্বাস হয়, তবেই মানুষ নিশ্চিন্ত ও যথার্থ সুখী হইতে পারে!

"বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিই ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়, সেইজন্য তাহাদের উপযোগী ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক; নতুবা কিছুতেই উহা তাহাদের সন্তোষপ্রদ হইবে না—কিছুতেই তাহারা উহার অনুষ্ঠান করিয়া যথার্থ সুখী হইতে পারিবে না। নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী সেই সেই ধর্ম্মমত, তাহাদের

নিজেকেই ভাবিয়া-চিন্তিয়া, দেখিয়া-ঠেকিয়া, বাছিয়া লইতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, গুরূপদেশ, সাধুদর্শন, সৎপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি ঐ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করে মাত্র।"

লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণদ্রব্য স্বামিজীর বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিয়াছিলেন, "পর্য্যটনকালে সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশের নানা প্রকার দূষিত জল পান করিতে হয়, তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ নিবারণের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা চরস প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকে। আমিও সেই জন্য এত লঙ্কা খাই।"

বাগ্‌বিতণ্ডায় ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম অনুভব প্রত্যক্ষের বিষয়, এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি কথায় কথায় বলিতেন, "The test of pudding lies in eating." তাহা না হইলে কিছুই চলিবে না। তিনি কপট সন্ন্যাসীদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। বলিতেন,—"ঘরে থাকিয়া মনের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া তবে বাহিরে যাওয়া ভাল। নতুবা নবানুরাগটুকু কমিবার পর প্রায় গাঁজাখোর সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া পড়িতে হয়।" হরিপদবাবু বলিলেন,—"কিন্তু ঘরে থাকিয়া সেটী হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন; আপনি সর্ব্বভূতকে সমান চোখে দেখা, রাগদ্বেষ ত্যাগ করা প্রভৃতি যে সকল কাজ ধর্ম্মলাভের প্রধান সহায় বলেন, তাহা যদি আমি আজ হইতে অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তাহা হইলে কাল হইতে আমার চাকর ও অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দণ্ড শান্তিতে থাকিতে দিবে না।" উত্তরে তিনি পরমহংসদেবের সর্প ও সন্ন্যাসীর গল্পটি বলিয়া বলিলেন,—"কখন ফোঁস ছেড়ো না আর কর্ত্তব্যপালন করিতেছ মনে করিয়া সকল কর্ম্ম করিও! কেহ দোষ করে দণ্ড দিবে, কিন্তু দণ্ড দিতে গিয়া কখন

রাগ করিও না।" পরে পূর্ব্বের প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া বলিলেন,—"এক সময়ে আমি এক তীর্থস্থানের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের অতিথি হইয়াছিলাম; লোকটীর বেশ ধর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাঁহার বেতন ১২৫৲ টাকা, কিন্তু দেখিলাম তাঁহার বাসার খরচ মাসে ২।৩ শত টাকা হইবে। যখন বেশী জানাশুনা হইল, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ত আয় অপেক্ষা খরচ বেশী দেখিতেছি—চলে কিরূপে? তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনারাই চালান। এই তীর্থস্থলে যে সকল সাধু সন্ন্যাসী আসেন, তাঁহাদের ভিতর সকলেই কিছু আপনার মত নন। সন্দেহ হইলে তাঁহাদের নিকট কি আছে না আছে, তল্লাস করিয়া থাকি। অনেকের নিকট হইতে প্রচুর টাকা কড়ি বাহির হয়। যাহাকে চোর সন্দেহ করি, তাহারা টাকা কড়ি ফেলিয়া পালায়, আর আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অপর ঘুসঘাস কিছু লই না।"

ভণ্ড সন্ন্যাসীদের কথায় তিনি আর একবার বলিয়াছিলেন, "অবশ্য অনেক বদমায়েস লোক ওয়ারেণ্টের ভয়ে কিম্বা উৎকট দুষ্কর্ম্ম করিয়া লুকাইবার জন্য সন্ন্যাসীর বেশ করিয়া বেড়ায় সত্য, কিন্তু তোমাদেরও একটু দোষ আছে। তোমরা মনে কর, কেহ সন্ন্যাসী হইলেই তাহার ঈশ্বরের মত ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই! সে পেট ভরিয়া খাইলে দোষ, বিছানায় শুইলে দোষ, এমন কি জুতা বা ছাতি পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহার করিবার যো নাই। কেন, তারাও ত মানুষ, তোমাদের মতে পূর্ণ পরমহংস না হলে তাহার আর গেরুয়া বস্ত্র পরিবার অধিকার নেই, ইহাও ভুল। এক সময়ে আমার একটী সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ হয়। তাঁহার ভাল পোষাকের উপর ভারি ঝোঁক। তোমরা তাঁহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ঘোর বিলাসী মনে করিবে, কিন্তু বাস্তবিক তিনি

যথার্থ সন্ন্যাসী।" হরিপদ বাবু কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে 'সাধু' বলায় তিনি উত্তর করিলেন, "আমরা কি সাধু? এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁহাদের দর্শন বা স্পর্শ মাত্রেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়।"

'বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল' বলায় স্বামিজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"রাজা হইলে আর খাওয়া পরার কষ্ট থাকে না; কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন! বিশ্বাস কি কখনও জোর করিয়া হয়? অনুভব না হইলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব।" আর একবার ভালই বা কি এবং মন্দই বা কি এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হওয়ায় বলিয়াছিলেন, "যাহা অভীষ্ট কার্য্যের সাধনভূত তাহাই ভাল; আর যাহা তাহার প্রতিরোধক তাহাই মন্দ; ভাল-মন্দের বিচার আমরা জায়গা উঁচুনীচুর বিচারের ন্যায় করিয়া থাকি। যত উপরে উঠিবে, তত দুই এক হ'য়ে যাবে। চন্দ্রেতে পাহাড় ও সমতল আছে; কিন্তু আমরা সব এক দেখি—সেইরূপ।" স্বামিজীর এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল যে, যে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভিতর হইতে এমন যোগাইত যে মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া যাইত।

বাল্যবিবাহের উপর স্বামিজী অত্যন্ত চটা ছিলেন। সর্ব্বদাই সকল লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁধিয়া সমাজের এই কলঙ্কের বিপক্ষে দাঁড়াইতে এবং উদ্যোগী ও সন্তুষ্টচিত্ত হইতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের প্রতি এরূপ অনুরাগও কোন মানুষের দেখা যায় না। বিলাত হইতে ফিরিবার পর যাঁহারা স্বামিজীর প্রথম দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন না বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি সন্ন্যাস আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন সম্বন্ধে কিরূপ সতর্ক ছিলেন। তাঁহার মত শক্তিমান্ পুরুষের এত বাঁধাবাঁধি নিয়মাদির আবশ্যক নাই, কোন লোক একবার

এ কথা বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ মন বেটা বড় পাগল, চুপ করে কখনই থাকে না; একটু সময় পেলেই আপনার পথে টেনে নিয়ে যাবে। সেজন্য সকলেরই বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতরে থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাসীরও সেই মনের উপর দখল রাখিবার জন্য নিয়মে চল্‌তে হয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর তাঁর খুব দখল আছে। তবে ইচ্ছা করিয়া কখন একটু আল্‌গা দেন মাত্র। কিন্তু কার কতটা দখল হয়েছে, তা একবার ধ্যান কর্ত্তে বস্‌লেই টের পাওয়া যায়। এই বিষয়ের উপর চিন্তা করিব মনে করিয়া বসিলে দশ মিনিটও ঐ বিষয়ে একক্রমে মন স্থির রাখা যায় না। সকলেই মনে করে—সে স্ত্রৈণ নয়, তবে আদর করিয়া স্ত্রীকে আধিপত্য করিতে দেয় মাত্র। মনকে বশে রাখিয়াছি মনে করাটা ঠিক ঐ রকম। মনকে বিশ্বাস করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিও না"

বেলগাঁওয়ে যাঁহারা স্বামিজীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা জড়বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব ও উচ্চাঙ্গের গণিতে তাঁহার অসাধারণ অধিকার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। বাস্তবিক এ সময়ে স্বামিজী ধর্ম্মবিষয়ক জটিল প্রশ্নগুলি প্রায়ই বিজ্ঞানসম্মত উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতেন। ধর্ম্মের যে কোন প্রসঙ্গ উঠিত, তিনি ঠিক তদনুরূপ একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দিতেন। দেখাইতেন—ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই লক্ষ্য মূলে এক অর্থাৎ সত্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা।

হরিপদবাবু বলেন :—বাস্তবিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে হিন্দুধর্ম্ম বুঝাতে এবং বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাতে স্বামিজীর মত আর কাকেও দেখা যায় নি।

ইতিপূর্ব্বে Times সংবাদপত্রে একজন একটী সুন্দর পদ্যে লিখিয়াছিলেন, ঈশ্বর কি, কোন্ ধর্ম্ম সত্য—প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত

কঠিন। সেই পত্রটি আমার তখনকার ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত ঠিক মিল হওয়ায় আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম; এক্ষণে স্বামিজীকে তাহা পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি বলিলেন, "লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।" আমারও ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল। খৃষ্টান মিসনরীদের সহিত "ঈশ্বর দয়াময় ও ন্যায়বান্ এককালে দুই-ই হইতে পারেন না" এই তর্কের মীমাংসা হয় নাই; মনে করিলাম, এ সমস্যা-পূরণ স্বামিজীও করিতে পারিবেন না। স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "তুমি ত science অনেক পড়িয়াছ দেখিতেছি। প্রত্যেক জড় পদার্থে দুইটী opposite forces—centripetal and centrifugal কি act করে না? যদি দুইটি opposite forces জড় বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা'হইলে দয়া ও ন্যায়—দুই opposite হইলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভবে না? All I can say is that you have very good idea of your God." আমি ত নিস্তব্ধ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস সত্য is absolute—সমস্ত ধর্ম্ম কখন এককালে সত্য হইতে পারে না। তিনি সে সব প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, "আমরা যে বিষয়ে যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি বা পরে জানিব, সে সকলই আপেক্ষিক সত্য or relative truth. Absolute সত্যের ধারণা আমাদের সীমাবদ্ধ মনবুদ্ধির অসম্ভব। অতএব সত্য absolute হইলেও বিভিন্ন মনবুদ্ধির নিকট বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি, নিত্য সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়া সে সকলগুলিই এক দরের বা এক শ্রেণীর, যেমন দূর এবং সন্নিকট স্থান হইতে photograph লইলে একই সূর্য্যের ছবি নানারূপ দেখায়, মনে হয় প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্যের—তদ্রূপ। আপেক্ষিক সত্য সকল, নিত্য

সত্যের সম্বন্ধে ঠিক ঐ ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্ম্মই সেই জন্য নিত্য সত্যের আভাস বলিয়া সত্য।"

Infinity (অনন্ত পদার্থ) সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা উঠিলে স্বামিজী যাহা বলিয়াছিলেন, সে কথাটি বড়ই সুন্দর ও সত্য—"There can be no two infinities." হরিপদবাবু, সময় অনন্ত (time is infinite) ও আকাশ অনন্ত (space is infinite) বলায় তিনি বলিলেন, "আকাশ অনন্তটা বুঝিলাম, কিন্তু সময় অনন্তটা ত বুঝিলাম না। যাহা হউক, একটা পদার্থ অনন্ত একথা বুঝি, কিন্তু দুইটা জিনিষ অনন্ত হইলে কোন্‌টা কোথায় থাকে? আর একটু এগোও দেখ্‌বে যে সময়ও যাহা আকাশও তাহাই। আরও অগ্রসর হইয়া বুঝিবে সকল পদার্থই অনন্ত—ও সেই সকল অনন্ত পদার্থ একটা বই দুইটা দশটা নয়।"

স্বামিজী বলিতেন, "চেতন অচেতন স্থূল সূক্ষ্ম সবই একত্বের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান। প্রথমে মানুষ যত রকম রকম জিনিষ দেখ্‌তে লাগ্‌লো, তাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন জিনিষ মনে করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিলে। পরে বিচার করে ঐ সমস্ত জিনিষগুলো ৬৩টা মূল দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়েছে স্থির কল্লে। ঐ মূলদ্রব্য-গুলোর মধ্যে আবার অনেকগুলো মিশ্রদ্রব্য বলে এখন তার সন্দেহ হয়েছে। আর যখন রসায়ন শাস্ত্র শেষ মীমাংসায় পৌঁছুবে, তখন সকল জিনিষই এক জিনিষেরই অবস্থাভেদ মাত্র বোঝা যাবে। প্রথমে তাপ আলো ও তাড়িত বিভিন্ন জিনিষ বোলে সকলে জান্‌তো। এখন প্রমাণ হইতেছে যে, ওগুলো সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলো চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করলে। তারপর দেখলে যে উদ্ভিদের প্রাণ আছে—চেতন প্রাণীর ন্যায় গমন-শক্তি নেই মাত্র।

তখন খালি দুই শ্রেণী রইলো—চেতন ও অচেতন। আবার কিছু-দিন পরে দেখা যাবে, আমরা যাকে অচেতন বলি, তাদেরও স্বল্প-বিস্তর চৈতন্য আছে।" (ইহার পরে অধ্যাপক জগদীশবাবু তাড়িত প্রবাহযোগে জড়বস্তুর চেতনত্ব পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন)।

"পৃথিবীতে যে উচ্চ নিম্ন জমী দেখা যায়, তাও সতত সমতল হ'য়ে একভাবে পরিণত হবার চেষ্টা কচ্ছে। বর্ষার জলে পর্ব্বতাদি উচ্চ জমীগুলি ধুয়ে গিয়ে গহ্বর সকল পলিতে পূর্ণ হচ্ছে। একটা উষ্ণ জিনিষ কোন জায়গায় রাখ্‌লে উহা ক্রমে চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যের ন্যায় সমান উষ্ণভাব ধারণ কর্ত্তে চেষ্টা করে। উষ্ণতাশক্তি এইরূপে সঞ্চালন-বিকীরণাদি (conduction, radiation) উপায় অবলম্বনে সর্ব্বদা সমভাব বা একত্বের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

"গাছের ফলফুল পাতা শেকড় আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখ্‌লেও বাস্তবিক উহারা যে এক, বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করেছে। তিনপল কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখ্‌লে এক সাদা রং রামধনুকের সাতটা রং এর মত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভক্ত দেখায়। সাদা চক্ষে দেখ্‌লে একই রং আবার লাল বা নীল চশমার ভেতর দিয়া দেখ্‌লে সমস্ত লাল বা নীল দেখায়।

"এইরূপ যাহা সত্য তাহা এক! মায়া দ্বারা আমরা পৃথক্ পৃথক্ দেখি মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত অদ্বৈত সত্যাবলম্বনে মনুষ্যের যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান উপস্থিত হ'লেও মানুষ সেই সত্যটাকে ধর্ত্তে পাচ্ছে না, দেখ্‌তে পাচ্ছে না।"

এই সব কথা শুনিয়া হরিপদবাবু বলিলেন, "স্বামিজী, আমাদের চোখের দেখাটাই কি সব সময় ঠিক সত্য? দু'খানা রেল এনে

সমান্তরাল রাখ্‌লে দেখায় যেন ক্রমে এক জায়গায় মিলে গেছে! উহারই নাম vanishing point—মরীচিকা রজ্জুতে অহিভ্রম প্রভৃতি optical delusion (দৃষ্টিবিভ্রম) সর্ব্বদাই হচ্ছে। Calespar নামক পাথরের নীচে একটা রেখাকে Double refractionএ দুটো দেখায়। একটা উড্‌পেন্সিল আধ গ্ল্যাস জলে ডুবুলে pencilএর জলমগ্ন ভাগটা উপরের ভাগ অপেক্ষা মোটা দেখায়। আবার সকল প্রাণীর চক্ষুগুলা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাবিশিষ্ট এক একটা Lens মাত্র। আমরা কোন জিনিষ যত বড় দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী তাহাই বা তদপেক্ষা বড় দেখে, কেননা তাদের চোখের লেন্স ভিন্ন শক্তি-বিশিষ্ট। অতএব আমরা যাহা স্বচক্ষে দেখি, তাই যে সত্য তারও ত প্রমাণ নেই! জনষ্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, মানুষ সত্য সত্য করে পাগল কিন্তু বাস্তবিক সত্য (Absolute truth) বোঝ্‌বার ক্ষমতা মানুষের নেই! কারণ ঘটনাক্রমে বাস্তবিক সত্য মানুষের হস্তগত হলে তাই যে বাস্তবিক সত্য এটী সে বুঝ্‌বে কি করে? আমাদের সমস্ত জ্ঞান Relative, Absolute বোঝ্‌বার ক্ষমতা নেই। অতএব Absolute বা জগৎকারণকে মানুষ কখনই বুঝ্‌তে পারবে না।"

স্বামিজী। তোমার বা সচরাচর লোকের absolute জ্ঞান না থাক্‌তে পারে, তা'বলে কারো নেই, এ কথা কি করে বল? জ্ঞান এবং অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বোলে দু'রকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমরা যাকে জ্ঞান বল বাস্তবিক উহা মিথ্যাজ্ঞান! সত্য জ্ঞানের উদয় হোলে উহা অন্তর্হিত হয়, তখন সব দেখায় এক। দ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞান-প্রসূত।

হরিপদ। আপনি যাকে সত্যজ্ঞান ভাবৃচেন তাও ত মিথ্যাজ্ঞান

হ'তে পারে, আর আমাদের যে দ্বৈতজ্ঞানকে আপনি মিথ্যাজ্ঞান বল্‌ছেন, তাও ত সত্য হ'তে পারে।

স্বামিজী। ঠিক বলেছ, তজ্জন্যই বেদে বিশ্বাস করা চাই। মুনি-ঋষিগণ সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানের পারে গিয়ে ঐ অদ্বৈত সত্য অনুভব ক'রে যা ব'লে গিয়েছেন, তাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য আমাদের বিচার ক'রে বল্‌বার ক্ষমতা নেই। যতক্ষণ না ঐ দুই অবস্থার পারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দুই অবস্থাকে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে পার্‌বো ততক্ষণ কেমন ক'রে বল্‌বো কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যে! শুধু দুটো বিভিন্ন অবস্থার অনুভব হচ্ছে—এইটী বলা যেতে পারে। এক অবস্থায় যখন থাকো তখন অন্যটাকে ভুল মনে হয়। স্বপ্নে হয়ত কল্‌কাতায় কেনা বেচা কল্লে, উঠে দেখ বিছানায় শুয়ে আছ। যখন সত্যজ্ঞানের উদয় হবে, তখন এক ভিন্ন দুই দেখ্‌বে না ও পূর্ব্বের দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা ব'লে বুঝ্‌তে পার্‌বে। কিন্তু এ সব অনেক দূরের কথা, হাতে খড়ি হ'তে না হ'তেই রামায়ণ মহাভারতও পড়্‌বার ইচ্ছা কোল্লে চল্‌বে কেন? ধর্ম্ম অনুভবের জিনিষ, বুদ্ধি দিয়ে বোঝ্‌বার নয়। হাতে নাতে কর্ত্তে হবে তবে এর সত্যাসত্য বুঝ্‌তে পার্ব্বে। এ কথা তোমাদের পাশ্চাত্য Chemistry, Physics প্রভৃতিরও অনুমোদিত। আর দুবোতল Hydrogen (উদজন) আর এক বোতল Oxygen (অম্লজন) নিয়ে জল কৈ বল্লে কি জল হবে, না, তাদের একটা শক্ত জায়গায় রেখে Electric current (তাড়িত প্রবাহ) তার ভিতর চালিয়ে তাদের Combination (সংযোগ, মিশ্রণ নহে) হ'লে তবে জল দেখ্‌তে পাবে ও বুঝ্‌বে যে জল Hydrogen ও Oxygen নামক গ্যাস হতে উৎপন্ন। অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধি কর্ত্তে গেলেও সেইরূপ ধর্ম্মে বিশ্বাস

চাই, অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণে যত্ন চাই, তবে যদি হয়। এক মাসের অভ্যাস ত্যাগ করাই কত কঠিন, দশবৎসরের অভ্যাসের ত কথাই নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির শত শত জন্মের কর্ম্মফল পিঠে বাঁধা রয়েছে। এক মুহূর্ত্ত শ্মশানবৈরাগ্য হ'ল আর বল্লে কিনা, কৈ আমি ও সব এক দেখ্‌ছি না।"

হরিপদ। স্বামিজী, আপনার ও কথা সত্য হ'লে যে fatalism (অদৃষ্টবাদ) এসে পড়ে। যদি বহুজন্মের কর্ম্মফল একজন্মে যাবার নয়, তবে আর চেষ্টা আগ্রহ কেন? যখন সকলের মুক্তি হবে তখন আমারও হবে।"

স্বামিজী। তা নয়। কর্ম্মফল ত অবশ্যই ভোগ কর্ত্তে হবে, কিন্তু অনেক কারণে ঐ সকল কর্ম্মফল, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হ'তে পারে। ম্যাজিক লণ্ঠনের ৫০ খানা ছবি ১০ মিনিটেও দেখান যায়—আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত রাতও কাটান যায়। উহা নিজের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে স্বামিজীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দর। "সৃষ্টিবস্তু মাত্রেই চেতন ও জড় সুবিধার জন্য এই দুই ভাগে বিভক্ত। মানুষ সৃষ্টবস্তুর চেতন ভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাণী বিশেষ। কোন কোন ধর্ম্মের মতে ঈশ্বর আপনার মত রূপবিশিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্ম্মাণ করেছেন; কেহ বলেন—মানুষ ল্যাজবিহীন বানর বিশেষ। কেহ বলেন—মানুষেরই কেবল বিবেচনা শক্তি আছে; কেহ বলেন—তাহার কারণ মানুষের মস্তিষ্কে জলের ভাগ বেশী—যাহাই হউক, মানুষ প্রাণী বিশেষ ও প্রাণিসমূহ সৃষ্টপদার্থের অংশমাত্র এ বিষয়ে মতভেদ নেই। এখন সৃষ্ট-পদার্থ কি বোঝ্‌বার জন্য একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ-রূপ উপায় অবলম্বন ক'রে এটা কি ওটা কি অনুসন্ধান কর্ত্তে লাগলেন,

আর অন্যদিকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতবর্ষের উষ্ণ হাওয়ায় ও উর্ব্বরা ভূমিতে শরীররক্ষার জন্য যৎসামান্য সময়মাত্র ব্যয় ক'রে কৌপীন প'রে প্রদীপের মিট্‌মিটে আলোয় ব'সে আদা জল খেয়ে বিচার কর্ত্তে লাগলেন, এমন জিনিষ কি আছে, যা জান্‌লে সব জিনিষ জানা যায়। [তাঁহাদের মধ্যে অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাজেই চার্ব্বাকের বস্তুসত্য মত (ultra-materialistic theory) থেকে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত পর্য্যন্ত সমস্তই আমাদের ধর্ম্মে পাওয়া যায়।] দুই দলই ক্রমে এক জায়গায় উপস্থিত হচ্ছেন ও এক কথাই এখন বল্‌তে আরম্ভ করেছেন। দুই দলই বল্‌চেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এক অনির্ব্বচনীয় অনাদি অনন্ত বস্তুর প্রকাশ মাত্র। কাল ও আকাশ (time and space) তাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতি সময়জ্ঞাপক কাল, যাহার অনুভবে সূর্য্যের গতিই আমাদের প্রধান সহায়। ভাবিয়া দেখিলে সেই কালটাকে কি মনে হয়? সূর্য্য অনাদি নহে; এমন সময় ছিল যখন সূর্য্যের সৃষ্টি হয়নি। আবার এমন সময় আস্‌বে যখন আবার সূর্য্য থাক্‌বে না, ইহা নিশ্চিত। তা হ'লে অখণ্ড সময় একটি অনির্ব্বচনীয় ভাব বা বস্তুবিশেষ ভিন্ন আর কি? আকাশ বা অবকাশ বল্‌লে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎ সম্বন্ধীয় অল্প সীমাবদ্ধ জায়গা বিশেষ বুঝি। কিন্তু উহা সমগ্র সৃষ্টির অংশমাত্র বৈ আর কিছুই নয়। এমন অবকাশও থাকা সম্ভব, যেখানে কোন সৃষ্ট বস্তুই নাই। অতএব অনন্ত আকাশও তদ্রূপ সময়ের মত অনির্ব্বচনীয় একটি ভাব বা বস্তু বিশেষ। এখন সৌরজগৎ ও সৃষ্ট বস্তু কোথা হ'তে কিরূপে এল? সাধারণতঃ আমরা কর্ত্তা ভিন্ন ক্রিয়া দেখ্‌তে পাই না। অতএব মনে করি, এই সৃষ্টির অবশ্য কোন কর্ত্তা আছেন, কিন্তু তা হ'লে সৃষ্টিকর্ত্তারও ত সৃষ্টিকর্ত্তা আবশ্যক, তা থাক্‌তে পারে

না। অতএব আদিকারণ সৃষ্টিকর্ত্তা বা ঈশ্বরও অনাদি অনির্ব্বচনীয় অনন্ত ভাব বা বস্তু বিশেষ। অনন্তের ত বহুত্ব সম্ভবে না, তাই ঐ সকল কয়টি অনন্ত পদার্থই এক ও একই ঐ সকল রূপে প্রকাশিত।

হরিপদবাবু দেখিলেন, স্বামিজী শুধু দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াই নিরস্ত হন নাই, নাটক নভেলাদিও বিস্তর পড়িয়াছেন। এক দিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী Pickwick Papers হইতে দুই তিন পাতা মুখস্থ বলিলেন। হরিপদবাবু নিজেও ঐ গ্রন্থখানি অনেকবার পড়িয়াছিলেন, সুতরাং বুঝিতে পারিলেন, কোন্ স্থান হইতে তিনি আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া তাঁহার বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ হইল। ভাবিলেন,— 'সন্ন্যাসী হইয়া সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়া এতটা মুখস্থ বলিলেন? পূর্ব্বে বোধ হয় অনেকবার ঐ পুস্তক পড়িয়াছিলেন।' কিন্তু জিজ্ঞাসা করায় স্বামিজী বলিলেন,—"দুইবার পড়িয়াছি। একবার স্কুলে পড়িবার সময় ও আজ পাঁচ ছয় মাস হইল আর একবার।" হরিপদবাবু অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে কেমন করিয়া স্মরণ রহিল? আমাদের কেন থাকে না?' স্বামিজী বলিলেন,—"একান্তমনে পড়া চাই, আর খাদ্যের সারভাগ হইতে প্রস্তুত রেতের অপচয় না করিয়া তা assimilate (শরীরের অন্তর্ভুক্ত) করা চাই।"

আর একদিন স্বামিজী মধ্যাহ্নে একাকী শয্যায় শয়ন করিয়া একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতেছিলেন, হরিপদবাবু অন্য ঘরে ছিলেন। হঠাৎ স্বামিজী এরূপ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন যে, এ হাসির বিশেষ কোন কারণ আছে ভাবিয়া হরিপদবাবু তাঁহার ঘরের দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বিশেষ কিছুই হয় নাই, স্বামিজী যেমন বই পড়িতেছিলেন তেমনই পড়িতেছেন, তিনি প্রায় ১৫ মিনিট স্বামিজীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন, তথাপি স্বামিজীর দৃষ্টি

তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল না। খানিকপরে স্বামিজী তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন ও তিনি অতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছেন শুনিয়া বলিলেন,—'যখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা একমনে এক প্রাণে সমস্ত ক্ষমতার সহিত করিতে হয়। গাজীপুরের পাওহারী বাবা ধ্যান জপ পূজাপাঠ যেমন একমনে করিতেন, তাঁহার পিতলের ঘটীটিও তেমনি একমনে মাজিতেন। এমনি মাজিতেন যে সোনার মত দেখাইত।"

মিত্রজা বলেন,—"স্বামিজী অনেক সময় ঠাট্টা বিদ্রূপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাষ্টারের কাছে বসার মত ছিল না। খুব রঙ্গরস চলিতেছে, বালকের মত হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, আবার তখনই এমনি গম্ভীরভাবে জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে তাঁহার ধীর গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিত—'ইঁহার ভিতর এত শক্তি! এই ত দেখিতেছিলাম আমাদেরই মত একজন!' আমার বাটীতে কত রকম লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত। কেহ আসিত উপদেশ লইতে, কেহ আসিত পাণ্ডিত্যের আকর্ষণে, কেহ বিদ্যাপরীক্ষা মানসে, আবার কেহ বা শুধু খোসগল্প শুনিবার জন্য। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল যে যে ভাবেই আসুক না কেন, তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন ও তাহার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টির নিকট হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার বা কোন কিছু গোপন রাখিবার সাধ্য ছিল না। তিনি যেন প্রত্যেকের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন। একটি সম্ভ্রান্ত ধনিসন্তান পরীক্ষার ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্য প্রায় তাঁহার নিকট আসিত ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে এইরূপ বলিত। স্বামিজী কিন্তু তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া

বলিলেন; 'এম. এ. টা পাশ করে তারপর আমার কাছে সাধু হবার জন্য এসো। কারণ সন্ন্যাসী হওয়ার চেয়ে এম. এ. পাশ করাটা ঢের সোজা।' ঐ সময়ে আমার বাসায় একটি চন্দন বৃক্ষের তলায় তাকিয়া ঠেশ দিয়া তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা জন্মেও ভুলিতে পারিব না।"

এই সময়ে হরিপদবাবুর একটা বদ্ অভ্যাস ছিল। তিনি প্রত্যহ স্বাস্থ্যের জন্য নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিতেন। স্বামিজী সে কথা জানিতে পারিয়া একদিন বলিলেন,—"যখন দেখিবে কোন রোগ এত প্রবল হইয়াছে যে শয্যাশায়ী করিয়াছে, আর উঠিবার শক্তি নাই, তখনই ঔষধ খাইবে, নতুবা নহে। Nervousness, debility (স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য) প্রভৃতি রোগের শতকরা ৯০টা কাল্পনিক। ঐ সকল রোগের হাত হইতে ডাক্তারেরা যত লোককে বাঁচান, তার চেয়ে বেশী লোককে মারেন। মনের অবস্থা যদি সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়, তাহা হইলে কোন পীড়া থাকে না।" তারপর বলিলেন,—'আর দিনরাত পীড়ার কথা ভাবিয়াই বা কি হইবে? মনে প্রফুল্লতা আন, ধর্ম্মপথে থাক, সদ্বিষয়ে চিন্তা কর, আমোদ আহ্লাদ কর, কিন্তু সাবধান! আমোদ করিতে গিয়া যেন শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আনিয়া ফেলিও না বা এমন কিছু করিও না যাহাতে চিত্তে অনুতাপ জন্মে। আর মৃত্যুর কথা বলিতেছ—তা তোমার আমার মত ২।৪টা লোক ম'লেই বা কি আসে যায়? ওতে পৃথিবীটা উল্টে যাবে না। এমন মনে করোনা যে তোমার আমার অভাবে পৃথিবীটা একেবারে অচল হয়ে যাবে বা মহা অনর্থের সৃষ্টি হবে।' সেই দিন হইতে মিত্রজা অকারণ ঔষধ সেবনের অভ্যাস ত্যাগ করেন।

এই সময়ে নানাকারণে হরিপদবাবুর সহিত তাঁহার উর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের মনোমালিন্য চলিতেছিল। একটু কড়া কথা

বলিলেই তিনি চটিয়া আগুন হইতেন, কিন্তু মুখে তাহাদের কিছু বলিতে পারিতেন না, চাকরীর মায়াও ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কারণ চাকরিটি ভাল, উপার্জ্জন যথেষ্ট ছিল। সুতরাং অন্তরের ক্রোধ বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারিয়া তিনি দিবারাত্র সাহেবদিগের নিন্দা ও গ্লানি করিতেন। স্বামিজী একদিন তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া বলিলেন,—"দেখ, তুমি টাকার জন্য চাকরী করিতে আসিয়াছ এবং যে কাজ কর তাহার জন্য উপযুক্ত বেতনও পাও। তবে কেন দিনরাত এই সব তুচ্ছ বিষয় লইয়া তোলাপাড়া কর আর 'কি বন্ধনেই পড়িয়াছি' বলিয়া আক্ষেপ কর? কেহ তোমাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, তুমি ইচ্ছা করিলেই কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতে পার। তবে কেন দিনরাত মনিবের নিন্দা ও সমালোচনা কর? যদি ভাব যে তোমার আর গতি নাই, তবে তাহাদের দোষ না দিয়া নিজেকে দোষ দাও। তুমি কি মনে কর তুমি কাজ কর বা না কর তাহাতে তাহাদের কিছু আসে যায়? তুমি ছাড়িয়া দিলে এখনই শত শত লোক ঐ পদের প্রার্থী হইবে। তবে কেন মনের তাপ বাড়াও? তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা নীরবে সম্পাদন করিয়া যাও।" এইরূপে স্বামিজী মিত্রজাকে মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন—"আপ্ ভাল ত জগৎ ভাল। আমরা নিজেদের ভিতরে যেমন বাহিরে ঠিক সেই রকম দেখি। আজ থেকে মন্দটি দেখা একেবারে ত্যাগ কর, দেখিবে তোমার উপর অন্যলোকের পূর্ব্বভাবও কেমন ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আমাদের ভিতরকার ছবিই আমরা জগতে প্রকাশ রহিয়াছে দেখি।"

ইতিপূর্ব্বে হরিপদবাবু ভগবদ্গীতা অনেকবার পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া উহার মধ্যে

বুঝিবার বড় কিছু নাই মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামিজীর মুখে গীতার দু' একটী স্থলের ব্যাখ্যা শুনিয়া গীতা-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বধারণা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তিনি বলেন, "সেই থেকে বুঝিলাম গীতা কি অদ্ভুত গ্রন্থ! প্রতি কার্য্যে, প্রতি চিন্তায় গীতার শিক্ষা কি প্রয়োজনে আসিতে পারে। কিন্তু স্বামিজীর উপদেশে আমি শুধু গীতা নহে কার্লাইলের রচনাবলী ও জুলস্‌ভার্ণের বৈজ্ঞানিক-রহস্যপূর্ণ উপন্যাসগুলিরও মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

আপনার মত বজায় রাখিতে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ জেদ দেখা যায়। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আবার উহার বিশেষ প্রকাশ। স্বামিজী ঐ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প বলিতেন। গল্পটি এইরূপ :—

কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। আর একজন রাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, সংবাদ পাইয়া তিনি একটি মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিলেন ও রাজ্যরক্ষার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন, "রাজ্যের চতুর্দ্দিকে একটি গভীর খাল কাটিয়া তাহার ধারে বৃহৎ ও উচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করা দরকার।" ইহা শুনিয়া সূত্রধর বলিল, "হাঁ ঠিক বটে, তবে প্রাচীরটা কাষ্ঠনির্ম্মিত হইলেই ভাল হয়।" চর্ম্মকার ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, 'না, কাষ্ঠ অপেক্ষা চর্ম্ম অধিক মজবুত, সুতরাং প্রাচীরটা চর্ম্মেরই হউক।' কামার ইহা শুনিয়া হাসিয়া কহিল, "চামড়া আর কত মজবুত হইবে? তার চেয়ে লোহার দেওয়ালই ভাল, ভেদ ক'রে গুলিগোলা আস্‌তে পারবে না।' উকীল মোক্তারেরা বলিলেন,—"মহারাজ, ও সব কিছুই করিতে হইবে না। শত্রুপক্ষকে যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হউক

যে, এইরূপ ভাবে বলপূর্ব্বক পরের সম্পত্তি লইবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। এ কার্য্য সম্পূর্ণ অন্যায় ও আইনবিরুদ্ধ।'

তখন পুরোহিত মহাশয়েরা বলিলেন, "তোমরা সকলেই বাতুলের মত প্রলাপ বকিতেছ যে হে! দেবতার সন্তোষ অগ্রে না করিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। মহারাজ, হোম যাগ করুন, স্বস্ত্যয়ন করুন, তুলসী দিন, দেখিবেন কাহারও সাধ্য নাই—আপনার একটী প্রজার কেশাগ্র স্পর্শ করে।" এইরূপে রাজ্যরক্ষার পরিবর্ত্তে সকলেই নিজ নিজ মত বজায় রাখিবার জন্য মহা কোলাহল, তর্ক ও পরিশেষে আত্ম-কলহে ব্যাপৃত হইল। গল্পটী শেষ করিয়া স্বামিজী বলিলেন,—'অধিকাংশ লোকই এইরূপ। আমি যা বুঝি আর কেউ তেমন বোঝে না—এই ভাবটা সকলেরই মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।'

পূর্ব্বে বলিয়াছি—পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামিজী কাহারও নিকট হইতে এক কপর্দ্দক গ্রহণ করিবেন না বা নিজের নিকট কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সুতরাং অপরের নিকট হইতে যাচ্ঞা করা দূরে থাকুক, সাধিয়া দিলেও লইতেন না। কেবল নিতান্ত ভক্ত বন্ধুদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাদের মনে ক্লেশ দিতে অনিচ্ছুক হইয়া কখন কখন একখানি কাপড়, একজোড়া খড়ম, একখানি রেলওয়ে টিকিট বা ঐরূপ কোন সামান্য শ্রদ্ধার দান গ্রহণ করিতেন। কোলাপুরের রাণী তাঁহাকে কোন একটি বহুমূল্য উপহার গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া-ছিলেন, কিন্তু স্বামিজী কিছুতেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে রাণী তাঁহাকে একজোড়া গেরুয়া বস্ত্র পাঠাইয়া দেন—দরকার ছিল বলিয়া তিনি উহা গ্রহণ করিয়া পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করতঃ রাণী-প্রদত্ত নববস্ত্র পরিধান করিলেন ও বলিলেন,—

'সন্ন্যাসীর বোঝা যত কম হয় ততই ভাল।' হরিপদবাবুও তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইলে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া অবশেষে তাঁহার মারহাট্টি জুতার পরিবর্ত্তে একজোড়া জুতা ও একগাছি বেতের ছড়ি তাঁহার সহিত দিয়াছিলেন।

একদিন স্বামিজী হরিপদবাবুকে বলিলেন, "তোমার সহিত অরণ্যে তাঁবু খাটাইয়া আমার কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু চিকাগোয় ধর্ম্মসভা হইবে, যদি তথায় যাইবার সুবিধা হয় ত যাইব।" এই কথা শ্রবণ করিয়া হরিপদবাবু আনন্দের আবেগে লাফাইয়া উঠিলেন ও তৎক্ষণাৎ চাঁদা তুলিবার জন্য বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু স্বামিজী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'এখন নয় বৎস! এখনও সময় হয় নাই। রামেশ্বর দর্শন শেষ না হইলে অন্য কিছুতেই হাত দিতে পারিতেছি না।'

স্বামিজী রামেশ্বর যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া হরিপদবাবু বাটীর মধ্যে গিয়া গৃহিণীকে এই সংবাদ দিলেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে হরিপদবাবুর গৃহিণী মন্ত্র লইবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন, কিন্তু হরিপদবাবু বলিয়াছিলেন, 'যাকে তাকে গুরু করিও না, এমন লোককে গুরু করিবে, যেন তাঁহাকে দেখিয়া আমারও ভক্তি হয়। কোন সৎপুরুষকে যদি গুরুরূপে পাই, তাহা হইলে মন্ত্র লইব, নতুবা নহে।' তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হন। কিন্তু এরূপ মনোমত গুরু না পাওয়াতে তাঁহাদের মনের ইচ্ছা এতাবৎকাল পূর্ণ হয় নাই। স্বামিজীকে দেখিয়া অবধি হরিপদবাবুর মনে তাঁহাকেই গুরুরূপে লাভ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সন্ন্যাসী যদি তোমার গুরু হন, তাহা হইলে তুমি শিষ্যা হইতে ইচ্ছা কর

কি ?” তিনিও সাগ্রহে বলিলেন, “উনি কি গুরু হইবেন ? হইলে ত আপনাদের কৃতার্থ মনে করি।” হরিপদবাবু আনন্দিত হইয়া বলিলেন, ‘আমি যেমন করিয়া পারি স্বামিজীকে রাজী করাইব। ওঃ কি লোক ! এ সুবিধা ছাড়িয়া দিলে আর কি জীবনে এমন লোকের দেখা পাইব ?’ এই বলিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামিজী, আমার একটা প্রার্থনা পূরণ করিবেন ?” স্বামিজী প্রার্থনা জানাইবার আদেশ করিলে তিনি সস্ত্রীক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন, স্বামিজী প্রথমে রাজী হইলেন না, বলিলেন, ‘গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল, গুরু হওয়া বড় কঠিন। শিষ্যের সব ভার ঘাড়ে লইতে হয়। বিশেষ আমি সন্ন্যাসী। আমি কোথায় মায়াপাশ কাটাইবার চেষ্টা করিব—না আরও বেশী ফাঁদে পা দিবার কথা বলিতেছে। তা ছাড়া দীক্ষার পূর্ব্বে গুরুশিষ্য অন্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া দরকার ইত্যাদি।’ কিন্তু হরিপদবাবু স্বামিজীর কথায় ভুলিলেন না। তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া সাশ্রুনয়নে কহিলেন, ‘স্বামিজী, যদি আপনি আজ আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ না করেন, তবে আমরা চিরদিনের জন্য জীবন্মৃত হইয়া থাকিব।’

স্বামিজী তাঁহার দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৫ অক্টোবর তাঁহাদের উভয়কে দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষার পর হরিপদবাবু স্বামিজীর একখানি ফটো তুলিয়া লইবার জন্য বলিলেন। স্বামিজী প্রথমে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু অনেক বাদানুবাদের পর ও হরিপদবাবুর অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া শেষে উহাতে সম্মত হন।

২৭ অক্টোবর স্বামিজী হরিপদবাবুর গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলেন। মিত্রজা একখানি রেলওয়ে টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইয়া চরণধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, ‘স্বামিজী, জীবনে আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও

আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করি নাই, আজ আপনাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম।'

দাক্ষিণাত্যে

বেলগাম হইতে মরমাগোয়া নামক সমুদ্রতটবর্ত্তী পর্ত্তুগীজ উপনিবেশের মধ্য দিয়া স্বামিজী মহীশূর রাজ্যান্তর্গত বাঙ্গালোর নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় কয়েকদিবস উচ্চপদস্থ ও শিক্ষিত লোকদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছায় প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন। কিন্তু শীঘ্র তাঁহার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তিনি অবিলম্বে মহীশূর রাজার দেওয়ান স্যার কে, শেষাদ্রি আয়ারের নিকটে পরিচিত হইলেন। অল্পক্ষণ আলাপেই বুদ্ধিমান্ শেষাদ্রি আয়ারের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই যুবা সন্ন্যাসীটির মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ও ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে, যাহা কালে এ দেশের ইতিহাসে স্থায়ী রেখাপাত করিবে। স্বামিজী এই অমাত্যপ্রবরের বাটীতে প্রায় একমাসকাল থাকিয়া মহীশূর রাজ্যের অনেক গণ্যমান্য, সুশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন। তিনি যেখানেই যাইতে লাগিলেন, শুধু হিন্দু নহে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরও সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। মিঃ আবদুল রহমন সাহেব নামে মৈসুর রাজের একজন মুসলমান সভাসদ্ স্বামিজীর নিকট কোরাণের কয়েক স্থলের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন ও তৎসম্বন্ধে তাঁহার যে যে সন্দেহ ছিল, তাহা মিটাইয়া লইলেন। রহমন

সাহেব হিন্দু ফকিরের মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ গভীর জ্ঞান দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, স্বামিজী বহুদিন পূর্ব্বেই কোরাণের অর্থ ও আধ্যাত্মিক ভাব নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। শেষাদ্রি আয়ার এই "পণ্ডিত সাধু"টিকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিতেন, "এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতাবান্ লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা অনেকেই ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক বই পড়িয়াছি, কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইয়াছে? আমি ত আমাদের মধ্যে এমন কাহাকেও জানি না, যিনি শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ অনুধাবনে এই যুবক সন্ন্যাসীর সমকক্ষ। ইনি এক অত্যাশ্চর্য্য পুরুষ। বোধ হয় ইনি ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা হইয়াই জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, নতুবা এরূপ অল্প বয়সে বেদ-বেদান্তাদি সমগ্র শাস্ত্রে এরূপ অসাধারণ অধিকার কি করিয়া জন্মিল?"

এই "তরুণ আচার্য্য"কে দেখিয়া মহীশূর-রাজ প্রীত হইবেন মনে করিয়া স্যার শেষাদ্রি আয়ার স্বামিজীকে মহীশূরে লইয়া গিয়া মহারাজের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। গৈরিকবসনধারী স্বামিজী যখন মহারাজ শ্রীচামরাজেন্দ্র উদীয়ারের সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার রাজসুলভ ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন—স্বামিজীর বিদ্যা-বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মবিষয়ে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, কথাবার্ত্তা ও চালচলন সবই যেন তাঁহার হৃদয় হরণ করিল। তিনি স্বামিজীর বাসের জন্য রাজ-প্রাসাদে কতকগুলি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং প্রায়ই ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য বহু গুরুতর বিষয়েও স্বামিজীর মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন ও প্রত্যহ বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। ক্রমে মহারাজের সহিত স্বামিজীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। একদিন

মহারাজ সপার্ষদ সভাগৃহে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, আমার পার্ষদগুলিকে আপনার কেমন লাগিতেছে?" স্বামিজী উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আপনি স্বয়ং অতি মহানুভব ব্যক্তি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনি সদাসর্ব্বদা পার্ষদমণ্ডলী-বেষ্টিত থাকেন। আর মহারাজ পার্ষদেরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একরূপ।" রাজা এই নির্ভীক উত্তর শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সভার অন্যান্য লোকেরা প্রথমে একটু কৌতুকবোধ করিয়া পরক্ষণেই স্বামিজীর উপর বিরক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন, উত্তম সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ স্পষ্টবক্তা হইয়া থাকেন, কাহারও মুখ চাহিয়া কথা বলেন না। মহারাজ স্বামিজীকে আরও কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তিনিও ঐরূপ চমৎকার উত্তর দিতে লাগিলেন, এমন কি দেওয়ানজীর প্রতিও ঈষৎ কটাক্ষপাত করিতে বিরত হইলেন না। মহারাজ অবশেষে নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। দরবার শেষ হইলে তিনি স্বামিজীকে এক নিভৃতকক্ষে আহ্বান করিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন ও সর্ব্বশেষে বলিলেন, "স্বামিজী, আপনি যেরূপ স্পষ্টবাদী তাহাতে আমার ভয় হয় পাছে আপনার জীবনে কোন আশঙ্কা ঘটে। হয়ত কেহ বিষপ্রয়োগে আপনাকে হত্যা করিতে পারে—অন্যান্য অনেক সাধুর জীবন এইরূপে নষ্ট হইয়াছে।" স্বামিজী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, 'কি! আপনি কি ভাবেন, প্রকৃত সন্ন্যাসী প্রাণভয়ে সত্য বলিতে কুণ্ঠিত বা ভীত হয়? মনে করুন আপনারই পুত্র যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কিরূপ লোক, আমি কি বলিব আপনি সর্ব্বগুণাধার, আপনার মধ্যে যে যে গুণ নাই, ভয়ে বলিব, সে গুণ আছে? মিথ্যা বলিব? মহারাজ! তোষামোদ চাটুকারদিগের ব্যবসায়, সন্ন্যাসীর ব্যবসায় সত্যকথন।" মহারাজের সম্মুখে ঐরূপ বলিলেও তিনি কতবার মহারাজের অসাক্ষাতে তাঁহার

প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবই ছিল এইরূপ—যাহার যে দোষ বা দুর্ব্বলতা থাকিত, তাহার সম্মুখেই প্রকাশ করিয়া বলিতেন; কিন্তু অপরের নিকট তাহার বিষয়ে উল্লেখকালে কখনও তাহার গুণ ভিন্ন দোষ কীর্ত্তন করিতেন না।

মহীশূর রাজসভায় স্বামিজীর সহিত একজন বিখ্যাত অষ্ট্রীয় দেশবাসী সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলাপ হয়। সেই ব্যক্তি ও সভাস্থ অন্যান্য সকলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ সঙ্গীতে তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। আর এক দিন রাজপ্রাসাদে বৈদ্যুতিক আলোক প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একজন প্রসিদ্ধ তড়িৎশিল্পীর (electrician) সহিত তড়িৎ বিষয়ে স্বামিজীর অনেক কথাবার্ত্তা ও আলোচনা হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও সে ব্যক্তি তড়িৎ বিষয়ে নিজে একজন বিশেষজ্ঞ হইয়াও স্বামিজীর নিকট থই পায় নাই।

একদিন রাজবাটীর বৃহৎ দালানে প্রধান অমাত্যের সভাপতিত্বে বেদান্ত বিষয়ে একটি বৃহৎ পণ্ডিতসভা আহূত হইল। পণ্ডিতেরা অনেকে অনেক কথা বলিলেন, অনেক যুক্তি তর্ক দ্বারা বিভিন্ন মতবাদ স্থাপনে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মোটের উপর কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য হইল না। অবশেষে স্বামিজী কিঞ্চিৎ বলিবার জন্য আহূত হইলেন। তিনি আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও সেই পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে পাঁজি পুঁথি ছাড়িয়া তাঁহার নিজের প্রাণের ভাষায় বেদান্ত শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিলেন ও অন্যান্য দার্শনিক মতের সহিত মিলাইয়া ও সামঞ্জস্যবিধান করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বেদান্তের উপযোগিতা নির্দ্দেশ করিলেন। সভাস্থ সকলে তাঁহার চিন্তার মৌলিকতা ও দৃষ্টির প্রসার দেখিয়া চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া

রহিলেন। সকলেই বুঝিল, দর্শন তাঁহার নিকট কতকগুলি বাক্য ও ভাবের সমষ্টি মাত্র নহে—প্রকৃত প্রাণের বস্তু। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে নতমুখে সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

প্রধান অমাত্য স্বামিজীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া একদিন তাঁহাকে কোন উপহার গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার একজন সেক্রেটারীকে স্বামিজীর সহিত বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দোকানে গিয়া তাঁহার যে জিনিষ অভিরুচি হয়, তাহা কিনিয়া আনিতে বলিলেন। স্বামিজী অমাত্যের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া লোকটীর সহিত বাজারে গেলেন। সেক্রেটারী মনে করিলেন, যখন দেওয়ানজীর আদেশ ও স্বামিজীর উপহার তখন কি জানি কত টাকা ব্যয় হয়, এই ভাবিয়া তাঁহার চেক বইখানি সঙ্গে লইয়া বাজারে গেলেন, মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিলেন যে, আবশ্যক হইলে এক সহস্র মুদ্রাও খরচ করিবেন। দোকানে গিয়া স্বামিজী বালকের ন্যায় এ দ্রব্য ও দ্রব্য করিয়া বহু দ্রব্য দেখিলেন ও প্রশংসা করিলেন। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বলিলেন, 'বন্ধু, যদি আমি আমার অভিলষিত কোন দ্রব্য গ্রহণ করিলেই দেওয়ানজী সন্তুষ্ট হন, তবে এক কাজ করুন, এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চুরুট আনিয়া আমায় দিন।' সে ব্যক্তি ত তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক্। তিনি যাহা যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহার একটাও ত খাটিল না। তিনি জীবনে প্রথম দেখিলেন যে এতবড় একটা সুযোগ হাতে পাইয়াও লোকে তাহা ত্যাগ করিতে পারে। দোকান হইতে বাহির হইয়া স্বামিজী তাঁহার একটাকা মূল্যের চুরুটটী ধরাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন ও অনতিবিলম্বে প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেওয়ানজী প্রথমে তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিয়া যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, তারপর হাসিয়া

উঠিলেন। বুঝিতে পারিলেন, প্রকৃত সন্ন্যাসীরা এইরূপই হইয়া থাকেন।

একদিন মহারাজ স্বামিজী ও প্রধান অমাত্যকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিলে তিনি স্বামিজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "স্বামিজী, আমার দ্বারা আপনার কি কার্য্য হইতে পারে?" স্বামিজী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উত্তর না দিয়া জ্বলন্তভাষায় তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। তিনি ভারতের অবস্থার প্রতি মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঘণ্টাধিক কাল বক্তৃতা করিলেন। দেখাইলেন, ভারতের বলিতে আছে শুধু তাহার দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা, কিন্তু ভারতের নাই, ভারতের অভাব—বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও ভিতর হইতে আমূল সংস্কার। মহারাজ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী আরও বলিলেন—তাঁহার মনে হয় ভারতের যাহা কিছু আছে, তাহা পাশ্চাত্য জগৎকে দান করাই হইবে ভারতের কার্য্য এবং তিনি স্বয়ং পাশ্চাত্যবাসীদিগের নিকট বেদান্তধর্ম্ম প্রচার জন্য গমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "আমি চাই যে তাহারা আমাদিগকে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া আমাদের আর্থিক উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিবে।" বলিতে বলিতে ক্রমশঃ হৃদয়ের আবেগে তিনি অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন। মহারাজ তাঁহার বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাশ্চাত্য দেশে গমনের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কি জন্য জানি না—বোধ হয় রামেশ্বর-দর্শন অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া স্বামিজী মহারাজের নিকট এই অর্থসাহায্য গ্রহণে অসম্মত হইলেন। সেইদিন হইতে রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর ধারণা হইল, 'এই মহাপুরুষ ভারতের উদ্ধারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।'

যত দিন যাইতে লাগিল, ততই মহারাজ স্বামিজীর গুণে উত্তরোত্তর অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তারপর যেদিন স্বামিজী বিদায় গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন, সেদিন মহারাজের আন্তরিক বেদনা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তিনি স্বামিজীকে আরও কিছুকাল তাঁহার নিকট বাস করিতে অনুরোধ করিলেন, বলিলেন, "স্বামিজী, আমি আমার নিকট আপনার একটা কিছু স্মৃতিচিহ্ন রাখিতে চাই। যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে ফনোগ্রাফে আপনার কণ্ঠস্বরের একটা রেকর্ড তুলিয়া লই। আপনার প্রাণোন্মাদিনী ভাষায় ফনোগ্রাফে ২।৪ কথা বলুন, যেন চিরদিন আপনার কথা আমাদের কানে বাজিতে থাকে।" স্বামিজী সম্মত হইলে রেকর্ড তোলা হইল। আজও পর্য্যন্ত মহীশূরের রাজপ্রাসাদে সে রেকর্ড সযত্নে রক্ষিত আছে, তবে বহুদিন হইতে তাহা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ মৈসুররাজ স্বামিজীর গুণগ্রামের এতদূর অনুরাগী হইয়াছিলেন যে, এমন কি তাঁহার পাদপূজার পর্য্যন্ত আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজী উহাতে সম্মত হন নাই।

কিয়দ্দিন পরে স্বামিজী বলিলেন, আর তিনি থাকিতে পারিতেছেন না। একথা শুনিয়া মহারাজ স্বামিজীর সহিত বিবিধ মূল্যবান্ উপহার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, স্বামিজী ঐ সকল প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি সামান্য সন্ন্যাসী। বহুমূল্য উপহার লইয়া কোথায় রাখিব, কি করিব?" কিন্তু মহারাজ কিছুতেই ছাড়িলেন না। অবশেষে স্বামিজী বলিলেন, "রাজন্, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, পরিব্রাজক অবস্থায় অর্থ স্পর্শ বা কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিব না।" মহারাজ তথাপি পুনঃ পুনঃ উপহার গ্রহণের জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অগত্যা স্বামিজী তাঁহাকে নিরাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা যদি নিতান্তই না

ছাড়েন, তবে আমাকে ধাতু সম্পর্কবিহীন একটা হুঁকা দিন, ওটা আমার বেশ কাজে লাগিতে পারে।" মহারাজ তখন তাঁহাকে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত একটী সুন্দর রোজউড্ নির্ম্মিত হুঁকা দান করিলেন। মহীশূর হইতে প্রস্থানকালে মহারাজ স্বয়ং স্বামিজীর চরণযুগল ধারণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং প্রধান অমাত্য তাঁহার সঙ্গে একতাড়া নোট দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্বামিজী উহা লইতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "যদি তুমি আমায় কিছু দিতে ইচ্ছা কর, তবে কোচিনের একখানি টিকিট কিনিয়া দাও। আমি রামেশ্বর চলিয়াছি। ২।৪ দিন কোচিনে থাকিতেও পারি।" অমাত্য-বর অগত্যা তাঁহাকে কোচিন পর্য্যন্ত একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দিলেন ও কোচিন রাজ্যের দেওয়ান শঙ্করিয়ার নিকট তাঁহার একখানি পরিচয়-পত্র দিলেন।

কোচিনে তিনি অল্প কয়েকদিন কাটাইয়া কেরলের (মালাবার) অন্তর্গত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এখানকার চিত্রবৎ মনোরম শোভা সন্দর্শনে তিনি অতিশয় পুলকিত হইলেন ও রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষক প্রফেসর সুন্দর-রমণ আয়ারের * বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এ সময়ে মান্দ্রাজের সুবিখ্যাত পণ্ডিত মিঃ রঙ্গচারীয়ার মহারাজের কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন।

ত্রিবাঙ্কুরের এস, কে, নায়ার লিখিতেছেন :—

---

* ইনি এ সময়ে মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রিভাঙ্কুর রাজ্যের প্রধান রাজকুমার মার্ত্তণ্ডবর্ম্মার শিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাজকুমার তাঁহার সাহায্যে বি-এ পাশ করিয়া এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

"রঙ্গচারীয়ার ও সুন্দররমণ উভয়েরই সংস্কৃত ও ইংরাজীতে অগাধ পাণ্ডিত্য, ইঁহারা স্বামিজীর সহিত আলাপ করিয়া অতিশয় প্রীত ও উপকৃত হইলেন। বাস্তবিক স্বামিজীর সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতায় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। একস্থানে একসঙ্গে বহুব্যক্তির বহু প্রশ্নের উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার তাঁহার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। স্পেন্সার হউক, কালিদাস সেক্ষপীয়র হউক, ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ হউক, ইহুদীদিগের ইতিহাস হউক, আর্য্যসভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কথা হউক, অথবা বেদ-বেদান্ত, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র হউক কোন বিষয়ে তাঁহাকে পশ্চাৎপদ দেখা যাইত না। যে কোন প্রশ্ন হউক তাহার ঠিক উত্তরটি তাঁহার মুখে লাগিয়া আছে। তাঁহার মুখাবয়বে সরলতা ও মহত্ত্ব স্পষ্ট লেখা ছিল এবং নির্ম্মলহৃদয়, তপস্যাপূত জীবন, উদারবুদ্ধি, উন্মুক্ত চিত্ত, অসঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও সর্ব্বভূতে সহানুভূতি এইগুলি তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল।"

এখানেও তিনি সমগ্র ভারতীয় জাতির মধ্যে বহুবিধ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও পতিত জাতিদিগের উদ্ধার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে সুন্দররমণের পুত্র লিখিয়াছেন :—

"তিনি রাজেন্দ্রগমনে আমাদিগের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। যদি তাঁহার অঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে রাজাই মনে করিতাম। তাঁহার কথাবার্ত্তা ও ভাব সবই বিস্ময়জনক। ভারতের সমুদয় ভবিষ্যৎ সমস্যাগুলি যেন তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তিনি সমগ্র ভারতকে এক অখণ্ড প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত পদার্থরূপে দেখিতেন। বাস্তবিক তিনি অদ্ভুত লোক ছিলেন। ত্রিবান্দ্রমের যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল সেই অনুভব করিয়া

ছিল যে ভারতের কল্যাণের জন্য এক মহান্ আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে।”

আমরা এখানে সুন্দররমণের স্বরচিত বৃত্তান্তটী ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

“১৮৯২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ত্রিবান্দ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভারতের অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত একজন মুসলমান অনুচর ছিল। তাঁহারও বেশভূষা এইরূপ যে দেখিয়া মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইত। আমার দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক ২য় পুত্র তাঁহাকে মুসলমান মনে করিয়া সেই ভাবে আমাকে খবর দিল। আমি তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া তাঁহার যথার্থ পরিচয় প্রাপ্তির পর তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলাম। তিনি সর্ব্বপ্রথমেই আমাকে মুসলমান চাকরটীর আহারের বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি কোচিনরাজ্যের একজন পিয়ন, তত্রত্য দেওয়ান মহোদয়ের সেক্রেটারী ভিজাগাপট্টম কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ ডবলিউ, রামাইয়া বি, এ, কর্ত্তৃক স্বামিজীকে এখানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তাঁহার সহিত প্রেরিত হইয়াছিল। স্বামিজী নিজের জন্য কোনপ্রকার পরিচয়পত্র গ্রহণ বা সুবিধামত বন্দোবস্ত করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে এখানে কোনরূপ সংবাদ প্রেরণ করেন নাই। শুনিলাম, দুইদিন হইতে তিনি দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু অগ্রে মুসলমান অনুচরটীর আহারের ব্যবস্থা না হইলে স্বয়ং আহার করিতে সম্মত হইলেন না।

২।৪ মিনিট কথাবার্ত্তা কহিয়াই বুঝিলাম, স্বামিজী একজন বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ। জিজ্ঞাসা করিলাম, সাধারণতঃ তিনি কিরূপ খাদ্য ভোজনে অভ্যস্ত। তিনি উত্তর করিলেন, “যাহা আপনার অভিরুচি,

আমরা সন্ন্যাসী, যাহা পাই তাহাই খাই।” তিনি বাঙ্গালী জানিতে পারিয়া আমি বলিলাম, “বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেক মহৎ ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।” ইহার উত্তরে আমি প্রথম তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম ও তদীয় আধ্যাত্মিক শক্তির কথা শ্রবণ করিলাম। তিনি কেশববাবুকে শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনায় বালক বলিয়া উল্লেখ করাতে আমি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। তাহার পর শুনিলাম শুধু কেশববাবু নহেন, কিছুদিন পূর্ব্বেকার অনেক খ্যাতনামা বাঙ্গালীই এই মহাপুরুষের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং কেশববাবু স্বয়ং শেষ জীবনে তাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক জগতের অনেক নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মমতের বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এমন কি, অনেক ইউরোপীয় ব্যক্তিও শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত আলাপ করিতে ব্যগ্র হইতেন এবং তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাবিভাগের পরিচালক মিঃ সি, এইচ, টনি মহোদয় পরমহংসদেবের চরিত্র, প্রতিভা, উদারভাব এবং দৈবীশক্তির উল্লেখ করিয়া একটী সুবিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে স্বামিজীর আহার্য্য প্রস্তুত হইল, তিনি প্রায় দুইদিনের পর পরিতোষ সহকারে ভোজন করিলেন। তাঁহার আকৃতি, কণ্ঠস্বর, চক্ষের দিব্যজ্যোতিঃ, উচ্চভাব এবং অদ্ভুত বচনবিন্যাস আমাকে এতদূর মুগ্ধ করিল যে, আমি সেদিন আর রাজপুত্র মার্ত্তণ্ড বর্ম্মাকে পড়াইতে গেলাম না। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আমি স্বামিজীকে লইয়া সন্ধ্যার সময় ত্রিবান্দ্রম কলেজের রসায়ন-অধ্যাপক দাক্ষিণাত্যের প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত রঙ্গাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া আমরা ত্রিবান্দ্রম ক্লাবে গেলাম।

কিঞ্চিৎ পরে রঙ্গাচার্য্য উপস্থিত হইলে, আমি স্বামিজীকে তাঁহার সহিত, অধ্যাপক সুন্দররাম পিলের সহিত ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত পরিচিত করিয়া দিলাম। এই সময়কার একটী ঘটনার কথা আমার বেশ মনে আছে। নারায়ণ মেনান নামে আমার এক বন্ধু (ইনি বর্ত্তমানে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একজন দেওয়ান-পেশকার) ক্লাব হইতে বিদায়-গ্রহণ কালে একজন ব্রাহ্মণ দেওয়ান-পেশকারকে প্রণাম করিলে—শেষোক্ত ব্যক্তি শূদ্রকে প্রত্যভিবাদন করিবার প্রচলিত রীত্যনুসারে দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা বামহস্ত কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। স্বামিজীর দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে; তিনি এই ঘটনাটী লক্ষ্য করিলেন। তারপর কত লোক আসিল ও চলিয়া গেল। সর্ব্বশেষ আমরা পাঁচজন মাত্র রহিলাম—স্বামিজী, উক্ত দেওয়ান-পেশকার, তাঁহার ভ্রাতা অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্য ও আমি। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর আমরাও স্ব স্ব গৃহে যাইবার জন্য উঠিলাম। দেওয়ান-পেশকার স্বামিজীকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু স্বামিজী প্রতি-প্রণাম না করিয়া হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের নিয়মমত শুধু নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে পেশকার মহাশয়ের অতিশয় ক্রোধ জন্মিল। কিন্তু স্বামিজী এদিকে অতি শান্তস্বভাব এবং শিষ্ট ও মধুর ব্যবহারে অভ্যস্ত হইলেও বিশেষ প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি ছিলেন এবং প্রয়োজন হইলে কাহাকে কিরূপ উত্তর দিয়া নীরব করিতে হয় তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। দেওয়ান-পেশকারের উত্তরে বলিলেন, "আপনি যদি নারায়ণ মেনানকে প্রত্যভিবাদন করিবার সময়ে আপনাদিগের প্রচলিত পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন তবে আমি সন্ন্যাসীর রীতি অনুযায়ী প্রত্যভিবাদন করাতে আপনার ক্রোধের উদয় হওয়া কি সঙ্গত?" এই উত্তরে আশানুরূপ ফল ফলিল। পরদিন পেশকার মহাশয়ের ভ্রাতা আমাদিগের নিকটই আগমন

করিয়া পূর্ব্বরাত্রির ঘটনার জন্য স্বামিজীর নিকট ত্রুটী স্বীকার করিলেন।

ঐ দিন সন্ধ্যায় ক্লাবে অল্পক্ষণ থাকিলেও স্বামিজীকে দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি সকলেরই সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিয়াছিলেন কিন্তু অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্যকে তাঁহার সহিত আলাপের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বুঝিলেন। বাস্তবিক অগাধ পাণ্ডিত্য, ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা, ভাষায় অদ্ভুত অধিকার, প্রয়োজনমত বিপুল বিদ্যাবুদ্ধিকে আয়ত্তাধীনে আনিয়া কোন বিষয় হইতে নূতন শিক্ষা লাভ করা বা কাহারও যুক্তির ভ্রম-প্রমাদ প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা এবং প্রকৃতি ও মনুষ্যকৃত শিল্পের মধ্যে যাহা কিছু উত্তম ও সুন্দর তাহার প্রতি অনুরক্তি ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত উক্ত অধ্যাপকের সৌসাদৃশ্য ছিল।

পরদিন স্বামিজী রাজকুমার মার্ত্তণ্ড বর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি আমার শিক্ষাধীনে থাকিয়া এম, এ, পড়িতেছিলেন। এক্ষণে আমার নিকট হইতে এই নবাগত অতিথির অসাধারণ জ্ঞান ও মানসিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎএর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। আমি স্বামিজীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম ও আমার সাক্ষাতেই উভয়ের মধ্যে কথাবর্ত্তা চলিতে লাগিল। স্বামিজী ভ্রমণকালে অনেক দেশীয় রাজন্য-বর্গের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া রাজকুমারের মনে ঐ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য কৌতূহল উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। স্বামিজী বলিলেন তাঁহার সহিত যে সকল দেশীয় রাজার সাক্ষাৎ হইয়াছে তন্মধ্যে বরোদার গাইকোয়ারের কার্য্যদক্ষতা, স্বদেশপ্রীতি ও রাজকার্য্য পরিচালনে বিচক্ষণতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই প্রসঙ্গে

তিনি খেতড়ির ক্ষুদ্র রাজপুত রাজার গুণগ্রামেরও বহু প্রশংসা করিলেন এবং শেষে বলিলেন যে, তিনি যতই দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন ততই রাজাদিগের চরিত্র ও শক্তির অবনতি সাক্ষাৎ করিয়াছেন। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামিজী তাঁহার পিতৃব্য ত্রিবাঙ্কুররাজকে দেখিয়াছেন কি না? স্বামিজী বলিলেন "না।" * তারপর মহীশূর মহারাজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথার পর স্বামিজী রাজকুমারের শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ২।৪টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য লোকের ন্যায় রাজকুমারও স্বামিজীর আকৃতি প্রকৃতিতে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার ফটোগ্রাফ তুলিবার সখ ছিল। সুতরাং স্বামিজীর একখানি সুন্দর ফটোগ্রাফ লইলেন। পরে উহা মান্দ্রাজ মিউজিয়মের চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রেরিত হয়।

তিনি সর্ব্বশুদ্ধ নয় দিবস আমার বাটীতে ছিলেন। এই কয়দিনই তাঁহার সহিত বহু বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। সকল কথা আমার এখন স্মরণ নাই, তবে মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ হইলেও মোটের উপর ঐ নয় দিবসের স্মৃতি চিরদিন আমার মনে জাগরূক আছে ও আজীবন থাকিবে। বিজ্ঞানের স্পর্দ্ধার উল্লেখ করিয়া তিনি একদিন বলিলেন যে ধর্ম্মের যেমন গোঁড়ামী আছে বিজ্ঞানেরও তেমনি গোঁড়ামী দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্তই অনুমানসূচক এবং সমজাতীয় ঘটনাসমূহের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধানে অসমর্থ। অথচ অনেক

---

* ইহার দুই দিন পরে রাজ-দেওয়ান শঙ্কর সুব্বিয়ার মহোদয়ের সাহায্যে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের সহিত অল্পক্ষণের জন্য স্বামিজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মহারাজ তাঁহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া দেওয়ানজীকে তাঁহার থাকিবার ও রাজ্য মধ্যে যথেচ্ছভ্রমণ করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিকই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা জগতের সমুদয় রহস্যই ভেদ করিয়াছেন। অনেকে আবার অজ্ঞেয়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে শুধু তাঁহাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ প্রায়। বুঝা যায় যে, ভারতে চিত্তসমাধানের যে সকল বিজ্ঞানসম্মত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব তাহার কোন সংবাদই রাখে না এবং সেই জন্য অন্তঃপ্রকৃতির অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্বন্ধে কোন প্রকার মীমংসা করিতেও সমর্থ হয় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেখানে স্তব্ধ ও নিরস্ত, ভারতীয় মনোবিজ্ঞান সেখানে অপূর্ব্ব আলোক প্রদান করিয়াছে। দেখাইয়াছে, ঐ সকল উচ্চ অনুভূতি ও অবস্থাকে কি করিয়া চেষ্টার দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারাযায়। আর একটী বিষয় সম্বন্ধে স্বামিজী বলিয়াছিলেন—উহা লৌকিক ও অলৌকিক জগতের বিশেষত্ব। তিনি বলিয়াছিলেন মানুষ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ বন্ধনের মধ্যে বাস করে। এই উভয়কে অতিক্রম না করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ বা মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয় না। জাতিভেদের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ যতদিন নিঃস্বার্থ কর্ম্ম করিবেন ও মুক্ত হস্তে জ্ঞান বিতরণ করিবেন ততদিন তাঁহার বিনাশ নাই। তাঁহার কথাগুলি আজও আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—"ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষে পূর্ব্বে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করিবেন।" স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ ও সমাজে তাঁহাদিগের স্থান লইয়া কোনরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নিয়ম প্রচলন করিবার চেষ্টা তিনি আদৌ অনুমোদন করিলেন না। তিনি বলিলেন, "স্ত্রীলোক ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। প্রাচীন ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা দ্বারা তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদিগের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে পারিলে

আপনারাই বুঝিতে পারিবে সমাজের কোন্‌খানে তাহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত, কি কি কার্য্যে তাহাদের হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত এবং কোন্‌টী রক্ষা বা বর্জ্জন করা আবশ্যক।” আমি সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে চাহিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “বেদান্ত প্রচার দ্বারা পাশ্চাত্য দেশসমূহের সামাজিক অবস্থা আরও উন্নত করা দরকার। যাঁহারা প্রাচীন আচার বিচারের সম্মান করিতে চাহেন তাঁহারা উহা করুন, কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যে সকল হিন্দু কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উক্ত আচারাদি নিয়ম পালনে অক্ষম হইবেন তাঁহাদিগকে ঘৃণা প্রদর্শন করিবারও কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।”

স্বামিজী আমার আলয়ে উপস্থিত হইবার ২।৩ দিন পরে আমি ত্রিবান্দ্রমে আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে তাঁহার আগমন সংবাদ প্রেরণ করিলাম। ইনি এখনও জীবিত আছেন এবং আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। ইঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, প্রগাঢ় জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা, পবিত্র জীবন এবং অকপট ঈশ্বর-প্রীতির *জন্য* আমি ইঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতাম এবং এখনও করিয়া থাকি। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত রামারাও। ইনি ত্রিবাঙ্কুরের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাবিভাগের পরিচালক। স্বামিজীর আধ্যাত্মিক প্রভাব তীব্র ঈশ্বরানুরাগ দর্শনে রামারাও সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একদিন নিজ আবাসে ভিক্ষাগ্রহণের জন্য আকিঞ্চন করিতে লাগিলেন। স্বামিজীও আহ্লাদের সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভিক্ষান্তে উভয়ে একত্রে আমার বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বামিজী পূর্ব্ববৎ আমাদের সহিত বিবিধ শিক্ষাপ্রদ ও মনোহর আলাপ করিতে লাগিলেন। আমার আজও পর্য্যন্ত পরিষ্কার স্মরণ আছে যে, রামারাও তাঁহাকে একবার ইন্দ্রিয় নি

সম্বন্ধে ২।৪ কথা জিজ্ঞাসা করাতে স্বামিজী একটী অতি সুন্দর গল্পের অবতারণা করিলেন। গল্পটি অনেকাংশে 'কৃষ্ণকর্ণামৃতম্' রচয়িতা বিখ্যাত কবি লীলাশুকের উপাখ্যানের অনুরূপ। গ্রন্থের নায়ক শেষ অবস্থায় বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া তখনকার এক শ্রেষ্টিকন্যার প্রণয়ে পড়িয়া নির্য্যাতন ভোগ করিলে ক্ষোভে অনুতাপে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিল। এ ঘটনাটি স্বামিজী এমনই চমৎকার ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন যে আজ একুশ বৎসর পরেও আমি যেন তাঁহার কথাগুলি অবিকল সেই ভাবে শুনিতে পাইতেছি বলিয়া মনে হইতেছে। কুম্ভকোণামের ভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত শক্তিশালী সঙ্গীতজ্ঞ শরৎ শাস্ত্রীয়ারের অমর বংশীধ্বনির ন্যায় তাঁহার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি এখনও যেন আমার কর্ণে লাগিয়া আছে।

ঐ দিন বা তৎপর দিবস তিনি আমায় মান্দ্রাজের তদানীন্তন সহকারী একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল অধুনা পরলোকগত বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাসা অনুসন্ধান করিবার জন্য বলিলেন। মন্মথবাবু ঐ সময়ে ত্রিবান্দ্রমের রেসিডেণ্টের কোষাগারে এক তহবিল তছরূপ তদন্তে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সন্ধান পাওয়ার পর হইতে স্বামিজী প্রত্যহ প্রাতে তাঁহার বাটীতে গমন করিয়া একেবারে আহারাদি শেষ করিয়া আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। একদিন আমি ঐ জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, "দেখুন, আমাদের বাঙ্গালী জাত্‌টা এক জায়গায় দল বেঁধে থাক্‌তে বড় পচ্ছন্দ করে। তা ছাড়া মন্মথের উপর আমার দুটা দাবী আছে। এক ত উনি আমাদের সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র, দ্বিতীয়তঃ ও আমার সহাধ্যায়ী। তার ওপর আর

একটা কথা হচ্ছে এই যে, আপনাদের এই দক্ষিণ দেশে আসা অবধি আমি বরাবর এ দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, সুতরাং বহুদিন মাছ মাংসের সম্পর্কে আসি নাই, সে জন্যও মন্মথের ওখানে খাওয়াটা আমার একটু ভাল লাগ্‌ছে।" আমি মৎস্য ভক্ষণের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করিলাম। তদুত্তরে স্বামিজী বলিলেন, "ভারত-বর্ষের প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা মাংস ভক্ষণ করিতেন, এমন কি যজ্ঞাদির সময়ে বা অতিথিকে মধুপর্ক দিতে হইলে তখন গোবধ করা হইত।" তিনি আরও বলিলেন যে, "বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে মাংসভোজন প্রথা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে হিন্দু-শাস্ত্রে আমিষ অপেক্ষা নিরামিষ ভোজনের প্রশংসা আছে বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেটা কতদূর পালিত হইত তাহা বিচার্য্য বিষয়। আর এটাও ঠিক যে, আমিষ ভোজন প্রথার অনাদর হওয়াতেই এদেশের লোকের শক্তি সামর্থ্য এত হীন ও জাতীয় অবনতি এত গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। বলিতে গেলে প্রাচীন হিন্দুজাতি ও সম্মিলিত হিন্দুরাজ্য সমূহের স্বাধীনতা লোপের এক প্রধান কারণ এই মাংস ভক্ষণ প্রথার উচ্ছেদসাধন।" আমি তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে এইটুকু বুঝিলাম যে, তাঁহার মতে যদি হিন্দুজাতিটাকে জগতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় বেঁচে থাকৃতে হয় তবে তাদের আবার মাংসাশী হ'তে হবে। আমি একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার সহিত কিছুতেই একমত হইতে পারিলাম না। বরং 'অহিংসা পরমোধর্ম্মে'র পক্ষ অবলম্বন করিয়া শাস্ত্র ও সাধারণ যুক্তির সাহায্যে তাঁহার সহিত অনেক তর্ক করিলাম। এ সম্বন্ধে তাঁহার মতটা জানিতাম বলিয়া পরে তাঁহার আমেরিকায় অবস্থান কালে মাংসাদি ভোজনের কথা শুনিয়া আমি তেমন আশ্চর্য্য বোধ করি নাই, এবং বেশ বুঝিতে পারি ঐ বিষয়

লইয়া তখন তাঁহার বিরুদ্ধে যে একটা নিন্দা ও আন্দোলন হইয়াছিল তাহা তিনি কিরূপ নীরব অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় স্বামিজী দেওয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। সেদিনও পুনরায় ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। দেওয়ান সাহেব আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "প্রাচীনকালে যজ্ঞ বা অন্য কোন সময়েই প্রাণীবধ প্রথা প্রচলিত ছিল না।" ইহাতে কিয়ৎক্ষণ তর্ক বিতর্ক চলিল; শেষে দেওয়ানজীর জামাতা মৃত মিঃ এ, রামিয়ার স্বামিজীর কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, "যজ্ঞে পশুবধ ও মাংস-ভোজনের বৃত্তান্ত সত্য বটে, শাস্ত্রে উহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।" ঐ দিন 'ভক্তি' সম্বন্ধেও দেওয়ানজীর সহিত স্বামিজীর কিঞ্চিৎ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, কেমন করিয়া কথাটা উঠিল ও এ সম্বন্ধে কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা এক্ষণে আমার কিছুই স্মরণ নাই। দেওয়ান শঙ্কর সুব্বিয়ার সে সময়কার মধ্যে একজন অতিশয় বিদ্বান পুরুষ ছিলেন এবং অত অধিক বয়সেও (তখন তাঁহার বয়স ৫৮) খুব পড়াশুনা করিতেন ও নানাবিধ পুস্তকপাঠে প্রত্যহ আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতেন। কিন্তু সেদিন স্বামিজীর সহিত তাঁহার কথা-বার্ত্তা তেমন জমে নাই আর বেশীক্ষণ আলাপ করিবার মত অবকাশও তাঁহার ছিল না, সুতরাং আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। বিদায়-কালে দেওয়ানজী স্বামিজীকে বলিলেন রাজ্যমধ্যে ভ্রমণকালে তাঁহার যখন যে বিষয়ে প্রয়োজন হইবে তাহা স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীকে জানাইবামাত্র সিদ্ধ হইবে ইত্যাদি। কিন্তু স্বামিজীর কোন বিষয়ের প্রয়োজন হয় নাই বা তিনি কিছু প্রার্থনাও করেন নাই।

ইতিমধ্যে একদিন হুজুর আফিসের পেস্কার শ্রীযুক্ত পেরুমল পীলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য

ছিল ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে যে সকল বিবিধ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে ঐ সম্বন্ধে স্বামিজীর জ্ঞান কতটা তাহাই নির্ণয় করা। সুতরাং তিনি আসিয়াই অদ্বৈত বেদান্তের উপর গোটাকতক খোঁচা বসাইলেন কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে স্বামিজীর ন্যায় গুরু আচার্য্যশ্রেণীর লোকদিগের জ্ঞানের গভীরতার পরিমাণ নির্দ্ধারণে চেষ্টা করা অপেক্ষা তিলার্দ্ধকাল নষ্ট না করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে যতটা উচ্চভাব আদায় করিয়া লইতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করা অধিক বুদ্ধিমানের কার্য্য। এই উপলক্ষে আমি স্বামিজীর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করিলাম। তিনি ১৮৯৭ সালে মান্দ্রাজের ফার্ণান্ ক্যাস্‌লে নয় দিবস অবস্থানকালে আর একবার এটি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা এই। কোন আত্মাভিমানী ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিবামাত্র তিনি এক নিমিষে তাহার দৌড় বুঝিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বুদ্ধি ও বিচারানুরূপ উপদেশ দিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা এত অধিক এবং কৌশল এরূপ চমৎকার ছিল যে সে ব্যক্তি বুঝিতেও পারিত না তিনি কখন তাহাকে তাহার উপযুক্ত সমভূমিতে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। এদিনও পেস্কারের প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী 'ললিত বিস্তর' হইতে বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক তাঁহার সুললিতকণ্ঠে এমন মধুরভাবে আবৃত্তি করিলেন যে আগন্তুক ভদ্রলোকটির হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল এবং তিনি প্রশ্ন কর্ত্তার আসন ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই শ্রবণোৎসুক শ্রোতার পদ অধিকার করিয়া বসিলেন। স্বামিজী সেই সুযোগে তাঁহার চিত্তে বুদ্ধের বৈরাগ্য, সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীর মধ্যে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের একটি স্থায়ীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গটি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া চলিল, উহা শ্রবণ করিয়া

প্রশ্নকর্ত্তার পূর্ব্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইল। তিনি তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকারও করিলেন এবং প্রস্থানকালে বলিয়া গেলেন, "স্বামিজীর ন্যায় অদ্বিতীয় পুরুষ আর কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, এবং আজিকার এই কথাবার্ত্তা এ জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না।"

ইহার পর আরও কয়েকদিন ধরিয়া বহু বিষয়ের আলোচনা হইল এবং আমি তত্তৎ বিষয়ে স্বামিজীর অভিমত জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলাম। এখন সব কথা মনে নাই তবে দুটী বিষয় মোটামুটি বেশ স্মরণ আছে। একবার আমি তাঁহাকে সাধারণের সমক্ষে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, ঐরূপ বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার কখনও অভ্যাস হয় নাই সুতরাং উহাতে তিনি হাস্যাস্পদ ও অকৃতকার্য্য হইবেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাই যদি হয় তবে আপনি চিকাগোর বিরাট ধর্ম্মসভায় মহীশূরাধিপের অনুরোধ রক্ষার্থ হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইতে কেমন করিয়া সাহস করিতেছেন?' স্বামিজী ইহার যে উত্তরটী দিয়াছিলেন তাহা তখন আমরা মনঃপুত হয় নাই। ভাবিয়াছিলাম বুঝি কথাটা কাটাইয়া দিবার জন্য যাহোক একটা জবাব দিলেন, কারণ তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয় যে আমি তাঁহার কার্য্যসাধনের উপায় হইব এবং আমার মুখ দিয়াই তাঁহার বাণী জগতে ঘোষিত হইবে তাহা হইলে তিনি আমায় তদুপযোগী শক্তি নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন।" আমি বলিলাম "আমি ঈশ্বরের ওরূপ কিছু করা সম্ভব বা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করি না।" ঐরূপ বলিবার কারণও ছিল। আমি তৎকালে সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বগুলিতে যথেষ্ট বিশ্বাসবান্ হইলেও মূল শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ তখনও পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করি নাই। সুতরাং তাহাদের প্রতিপাদিত বিষয়গুলিতে

এতাদৃশ অন্তর্দৃষ্টি লাভ বা সে সম্বন্ধে এরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় নাই, যে তদ্দ্বারা স্বামিজীর বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হই। আমার কথা শুনিয়া স্বামিজী তৎক্ষণাৎ যেন প্রচণ্ড গদাহস্তে আমার উপর পড়িলেন। আমি বিশ্বের গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনে বিধাতার ক্ষমতার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছি দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'ছিঃ ছিঃ তোমার একি বুদ্ধি! যাঁহার শক্তির আদি অন্ত নাই তুমি তাঁকে সীমার মধ্যে আনিতে চাও? তুমি বহিরাচার ও বাক্যে গোঁড়ামী দেখাইলে কি হইবে? অন্তরে যে এখনও নাস্তিক রহিয়াছ, নতুবা এখনও তাঁর শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই কেন?'

আর একবার ভারতবাসীদের জাতি ও বর্ণতত্ত্ব লইয়া তাঁহার সহিত আমার মতভেদ হয়। তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ দেখিলেই বুঝিতে হইবে উহাতে দ্রাবিড় রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে"; আমি বলিলাম "তাহার অর্থ কি? মনুষ্যের বর্ণের তারতম্য জলবায়ু, আহার, কর্ম্ম ইত্যাদি নানা বাহ্য কারণের উপর নির্ভর করে।" স্বামিজী ইহার উত্তরে অনেক প্রতিবাদ করিলেন এবং বলিলেন অন্যান্য মনুষ্যজাতির ন্যায় ব্রাহ্মণও একটি মিশ্রিত জাতি। তাহাদের শোণিতগত বিশুদ্ধতার কথা নিতান্ত কাল্পনিক। আমি C. L. Brace ও আরও অনেক হোমারাও চোমরাও লোকের মত উদ্ধৃত করিয়া নিজ বাক্যের পোষকতা করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই টলিলেন না।

এইবার আমার বক্তব্য শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিব, তবে এইখানে একটা কথা বলা বিশেষ দরকার। তিনি যে কয়দিন আমাদের নিকট ছিলেন সে কয়দিন প্রত্যেকের হৃদয় তাঁহার নিকট বাঁধা পড়িয়াছিল। তিনি আমাদের প্রত্যেকের নিকট নিরবচ্ছিন্ন মধুরতা, কোমলতা ও সৌন্দর্য্যের আকর ছিলেন। আমার পুত্রেরা প্রায়ই সদাসর্ব্বদা তাঁহার

সংসর্গে থাকিত এবং তাহাদের একজন এখনও কথায় কথায় তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে ও তাঁহার আগমন ও অদ্ভুত চরিত্রের বিষয় অতি সুন্দর মনে করিয়া রাখিয়াছে। স্বামিজী গুটিকতক তামিল শব্দ শিখিয়াছিলেন এবং আমাদের বাটীর পাচক ব্রাহ্মণের সহিত তামিল ভাষায় কথোপকথন করিতে বড় আমোদ পাইতেন। আমাদের মনে হইত না যে, একজন বাহিরের লোক আমাদের পরিবারের মধ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গৃহ অন্ধকার হইয়া গেল।

তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর আমাদের ত্যাগ করিয়া গেলেন। প্রস্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। পণ্ডিত বঞ্চিশ্বর শাস্ত্রী নামে সংস্কৃত-ব্যাকরণরূপ দুরূহ শাস্ত্রে বিশেষ লব্ধপ্রবেশ এক ভদ্রলোক ত্রিবাঙ্কুরের প্রধান রাজকুমারের বৃত্তিভোগী ছিলেন এবং বিদ্যা, বিনয় ও ধর্ম্মশীলতার জন্য সকলের নিকট তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ছিল। রাজকুমার আমার অনুরোধে তাঁহাকে আমার পুত্রের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্বামিজী যতদিন আমাদের গৃহে রহিলেন ততদিন মধ্যে তিনি একবারও আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন নাই। শুনিয়াছিলেন বটে যে উত্তর ভারত হইতে একজন মহা-পণ্ডিত সাধু আমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ দেখা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বামিজী ও মন্মথবাবু যখন গাড়ীতে উঠিবার জন্য সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন ঠিক সেই সময়ে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আমাকে পুনঃ পুনঃ বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে যত অল্প সময়ের জন্যই হউক একবার যেন স্বামিজীর সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তাঁহার আগ্রহাতিশয্য দর্শনে আমি স্বামিজীর নিকট তাঁহার অভিপ্রায় নিবেদন করিলাম। তৎশ্রবণে তিনি তৎক্ষণাৎ পণ্ডিতজীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

মোটের উপর ৭মিনিট কি ৮ মিনিট কথাবার্ত্তা হইল। আমি সে সময় সংস্কৃত জানিতাম না, সুতরাং কি কথাবার্ত্তা হইল বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পণ্ডিতজী বলিলেন, "ব্যাকরণ শাস্ত্রেরই একটা মহা জটিল ও তর্কযোগ্য বিষয়ে প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল এবং ঐ অল্প সময়ের আলাপেই স্বামিজী সংস্কৃত ব্যাকরণে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।"

"এই ভাবে নয় দিনের অবসান হইল। এই নয়দিন আমার স্মৃতিপথে 'নয়দিনের আশ্চর্য্য'রূপে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত আছে, এ জীবনে আর সে স্মৃতি মুছিবার নয়। স্বামিজীর মহৎ চরিত্র ও অমানুষিক জীবন ইতিহাসে এক নূতন যুগের সৃষ্টিকাল বলিয়া গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। তবে তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব সুদূর ভবিষ্যতে ভিন্ন বোধগম্য হইবে না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা জনেন যে তিনি এই পবিত্র ভূমিতে যে সকল অমরকীর্ত্তি আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ দিব্য জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত একাসনে স্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। অতীত দিনের এই সকল ব্যক্তিগত স্মৃতি যদিও নিতান্ত সামান্য ও সেই মহনীয় আচার্য্যের চরিত্র মহিমার সম্যক্ তাৎপর্য্য প্রদানে অতীব অকিঞ্চিৎকর তথাপি যিনি তাঁহার সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নরসমাজের হৃদয়কে এমন বাঁধনে বাঁধিয়াছিলেন ও এমত করিয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয়ে স্মরণ করাও অল্প আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় নহে।"

স্বামিজী এখান হইতে রামেশ্বর অভিমুখে গমন করিলেন। পথে মদুরায় রামনাদরাজ ভাস্কর সেতুপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। সুশিক্ষিত ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের অন্যতম, ভক্তশ্রেষ্ঠ রামনাদপতি স্বামিজীর একজন বিশেষ অনুরাগী ভক্ত হইয়া উঠিলেন ও পরিশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব

গ্রহণ করিলেন। মহীশূর-রাজের ন্যায় ইঁহার নিকটও স্বামিজী সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও কৃষি বিষয়ক উন্নতি সাধন সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করেন ও ভারতের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান ও তাহার ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব সম্ভাবনার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। রামনাদ-রাজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন যে, এতদিনে সত্যই ভারতে একজন প্রকৃত কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছে। স্বামিজী সেই কর্ম্মবীর—দেশজননীর সেই সুসন্তান। স্বামিজীর কথাবার্ত্তার উপর তাঁহার এতদূর শ্রদ্ধা জন্মিল যে, তিনি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ চিকাগো মহাসভায় যাইবার জন্য বলিলেন ও সে জন্য যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন, কারণ তাঁহার মনে হইল, প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক আলোকের প্রতি প্রতীচ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার এরূপ সুযোগ আর সহসা হইবে না। কিন্তু স্বামিজী তখন রামেশ্বর দর্শনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র, সুতরাং এ সম্বন্ধে তিনি কি স্থির করেন পরে তাহা মহারাজের কর্ণগোচর করিবেন বলিয়া শীঘ্র ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর স্বামিজী রামেশ্বর দর্শন করিলেন। তাঁহার বহুকালের মনোবাসনা এতদিনে পূর্ণ হইল। রামেশ্বরের মন্দির অতি প্রকাণ্ড—দীর্ঘে ৪০০ হস্ত, প্রস্থে ১০০ হস্তের উপর এবং সিংহদ্বারটি প্রায় ১০০ ফিট উচ্চ। মন্দিরের প্রাঙ্গণ বেষ্টিয়া যে বারাণ্ডাগুলি আছে তাহাদের দৈর্ঘ্য মোটের উপর চারি সহস্র ফিট হইবে। দরজার উপর ও ছাদে কোন কোন প্রস্তরখণ্ড দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ ফিট হইবে।

রামেশ্বর দর্শন শেষ হইলে স্বামিজীর মনে কন্যাকুমারী দর্শনের অভিলাষ হইল। কন্যাকুমারী ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্ত। এখানে এক দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্বামিজী ভিক্ষা করিতে করিতে কুমারিকা অন্তরীপের মুখে উপস্থিত হইলেন এবং দেবী দর্শন সমাপ্ত

হইলে মন্দিরচত্বরে উপবিষ্ট হইয়া ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্ব গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সে চিন্তা বহুক্ষণ চলিয়াছিল। তৎ সম্বন্ধে তিনি পরে চিকাগো হইতে মঠের ভ্রাতাগণকে লিখিয়া ছিলেন—"Cape Comorinএ (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারী মন্দিরে—ভারতবর্ষের শেষ পাথরটুকরার উপর ব'সে ভাব্তে লাগ্লাম—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি লোককে Metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি এ সব পাগ্লামী। খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না—গুরুদেব বলতেন না? এই যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন ক'চ্ছে তার কারণ মূর্খতা; আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি আর দু'পা দিয়ে দলেছি" ইত্যাদি।

এই ভাবে দণ্ডের পর দণ্ড কাটিয়া গেল—তথাপি চিন্তার বিরা নাই। *

---

* শুনা যায়, কুমারিকা অন্তরীপে স্বামিজী ৺মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কুমারী কন্যাকে কুমারী পূজা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সম্ভবতঃ এই স্থানে মন্মথবাবুর সঙ্গে গিয়াছিলেন।

প্রব্রজ্যাকালের অন্যান্য কাহিনী

এ পর্য্যন্ত স্বামিজীর প্রব্রজ্যাকালের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি পাঠক যেন মনে করিবেন না তাহাই সম্পূর্ণ। সাধু সন্ন্যাসীর জীবনের কত ঘটনা চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যায়, কে তাহার সংবাদ রাখে! কত অরণ্যের নির্জ্জন পথ, কত কণ্টকময় বৃক্ষতল, কত কঠিন পাষাণশয্যা যে কত কাল হইতে কত সাধু সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজকের জীবনের কত কাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? স্বামিজীর জীবনেও এরূপ হইয়াছিল। আমরা তাঁহার জীবনের যে যে অংশ তাঁহার বা অন্যান্য লোকের নিকট অবগত হইতে পারিয়াছি তাহাই একত্রে গ্রথিত করিয়া পাঠকদিগের দৃষ্টির সম্মুখে ধরিয়াছি, কিন্তু যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই সব শেষ হয় নাই। এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার কিছু কিছু অপরের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু যাহার সম্বন্ধে স্বামিজী কি কারণ বশতঃ জানি না কখনও কোন কথা নিজমুখে প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, আবার এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যে সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত কিছু না বলিয়া কিছু কিছু আভাস ইঙ্গিত দিয়াছেন মাত্র। স্বামিজী-চরিত্র সম্যক্ বুঝিতে হইলে ঐ সকল ঘটনা বাদ দেওয়া চলে না। আমরা সেই জন্য এই স্থানে তাহাদের কতক কতক লিপিবদ্ধ করিলাম।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গাজীপুরের আড়পারে তাড়িঘাট ষ্টেশনে নিম্নলিখিত ঘটনাটী ঘটিয়াছিল।

স্বামিজী যখন ট্রেন হইতে তাড়িঘাট জংশনে অবতরণ করিলেন তখন মধ্যাহ্নকাল। নিদাঘ সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজে মরুময় উত্তরপশ্চিম

প্রদেশের বালুকারাশি অগ্নিতুল্য ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। মাঝে মাঝে উষ্ণ ঘূর্ণবাত্যা বহিতেছে। স্বামিজীর হস্তে একখানি থার্ডক্লাস টিকেট ও কম্বল এবং পরিধানে গেরুয়া আলখাল্লা। সঙ্গে আর কিছু নাই—এমন কি একটি জলপাত্র পর্য্যন্ত নহে। চৌকীদার তাঁহাকে ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে ছায়ায় বসিতে দিল না, বাহির করিয়া দিল। তিনি অগত্যা কম্বলখানি উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর পাতিলেন ও ওয়েটিং রুমের বাহিরে একটি খুঁটি হেলান দিয়া সেই কম্বলের উপর বসিয়া পড়িলেন।

আশে পাশে অনেক লোক দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মধ্যে উত্তর ভারতের একজন মধ্যবয়সী বেণে একটু দূরে স্বামিজীর ঠিক সম্মুখে ষ্টেশনের ছাউনীর নীচে একটা সতরঞ্চির উপর বসিয়াছিল এবং স্বামিজীর বিশুষ্কবদন ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দেখিয়া নানারূপ বিদ্রূপ ও তামাসা করিতেছিল। ঐ ব্যক্তি ও তাহার কয়েকজন সহচর গাড়ীতে স্বামিজীর সহিত একত্রে আসিয়াছে ও স্বামিজীকে যথেষ্ট বিরক্ত করিয়াছে। স্বামিজী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কয়েকটা ষ্টেশনে পানীয় জল সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে একটিও পয়সা না থাকাতে পাণিপাঁড়েদিগের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইলেন। কারণ তাহারা যাহাদিগের নিকট পয়সা পাইতেছিল সর্ব্বাগ্রে তাহাদের জল সরবরাহ করিতে লাগিল এবং ইতিমধ্যে ট্রেণও ছাড়িয়া দিতে লাগিল। বেণেটী এদিকে পয়সা খরচ করিয়া এক লোটা 'ঠাণ্ডা পানী' যোগাড় করিল ও তদ্দ্বারা আপন তৃষ্ণা দূর করিতে করিতে ঈষৎ অবজ্ঞাভরে স্বামিজীর দিকে চাহিয়া বলিল 'ওহে দেখ্‌ছো কেমন ঠাণ্ডা জল! তুমি ত সন্ন্যাসী হ'য়ে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছ। সঙ্গে এখন এমন একটি পয়সা নেই জল কিনে খাও। তা দেখ মজা! তার চেয়ে যদি আমার মত পয়সা

রোজগারের চেষ্টা কর্ত্তে তবে আর এ দুর্দ্দশা ভোগ কর্ত্তে হ'ত না।' সে ব্যক্তি এই প্রকার বাক্যবাণে স্বামিজীকে বিদ্ধ করিতে লাগিল অথচ তাঁহাকে এক বিন্দু জল দিয়া সাহায্য করিল না। তাহার মতে যাহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম না করিয়া সন্ন্যাসী হয় তাহাদের উপবাস করাই উচিত। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সে ব্যক্তি ট্রেণ হইতে নামিয়াও পূর্ব্ববৎ স্বামিজীকে লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল ও নিজে প্লাটফর্ম্মের ছায়ায় বসিয়া রৌদ্রক্লিষ্ট স্বামিজীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "দেখহে পয়সার ক্ষমতা দেখ—তুমি ত পয়সা কড়ি গ্রাহ্য কর না, তার ফলও দেখ—আর আমি পয়সা কড়ি রোজগার করি তার ফলও দেখ—এ সব পুরী, কচুরী, পেঁড়া, মিঠাই কি আর বিনা পয়সায় হয়?" স্বামিজী বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া নিজ চিন্তায় মগ্ন রহিলেন।

ইত্যবসরে আর একটি লোক, ঐখানেই তাহার বাড়ী, দক্ষিণ হস্তে একটি পুঁটলী ও লোটা এবং বাম হস্তে এক কুঁজা জল ও একটা সতরঞ্চি লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং ষ্টেশনের চারিদিকে বারকতক ঘুরিয়া অবশেষে স্বামিজীর নিকট আসিয়া বলিল, "বাবাজী, আপনি রৌদ্রে বসিয়া আছেন কেন? ভিতরে চলুন, আমি আপনার জন্য কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছি—দয়া করিয়া গ্রহণ করুন!" এই বলিয়া লোকটি তাঁহাকে লুচি ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া জল ও পান খাইতে দিল এবং সঙ্গে আনীত হুঁকা কলিকায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খাওয়াইল। তাঁহার সমুদয় অভাব এইরূপ আকস্মিকভাবে দূর হইতে দেখিয়া স্বামিজী আশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ব্যক্তি কে, কোথা হইতে আসিল ও কেমন করিয়া তাঁহার কথা জানিল। তাহাতে সে উত্তর করিল, "আমি একজন হালুয়াই। এখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে

আমার এক মিষ্টান্নের দোকান আছে। আমি আহারাদির পর ঘুমাইতে ছিলাম এমন সময়ে স্বপ্নে দেখিলাম একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বলিতেছেন, 'আমার সাধু ষ্টেশনে পড়িয়া অনাহারে কষ্ট পাইতেছেন। কাল হইতে তাঁহার খাওয়া দাওয়া হয় নাই। তুই শীঘ্র গিয়া তাঁর সেবা কর্।' আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই মনের খেয়াল ভাবিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু আরও দুইবার ঐ প্রকার স্বপ্ন দেখায় আর কালবিলম্ব না করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম ও তৎক্ষণাৎ পুরী ও তরকারী প্রস্তুত করিয়া সকালের প্রস্তুত মিঠাই ও কিঞ্চিৎ জল, পান ও তামাক লইয়া তাড়তাড়ি ষ্টেশনে দৌড়াইয়া আসিলাম।" স্বামিজী প্রশ্ন করিলেন, "আমিই যে সেই সাধু তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে?" সে ব্যক্তি বলিল, "আমারও প্রথমে ঐ সন্দেহ হইয়াছিল, সেই জন্য এখানে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় সাধুর দর্শন না পাওয়ায় বুঝিতেছি ঐ সাধু আপনি ব্যতীত আর কেহ নহেন।"

শ্লেষপ্রিয় বেণিয়াটি এতক্ষণ ধরিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল। শেষে সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বামিজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

রাজপুতনায় আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেটি বড় কৌতুককর। স্বামিজী যে কামরায় আসিতেছিলেন সেই কামরাতে দুইজন ইংরাজ ছিলেন। তাঁহারা স্বামিজীকে নিরক্ষর সাধু বিবেচনায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পরস্পরের মধ্যে নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ ও হাসাহাসি করিতেছিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া ট্রেণ একটা ষ্টেশনে থামিলে স্বামিজী ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট ইংরাজীতে এক গ্লাস খাবার জল চাহিলেন। সাহেবদ্বয় যখন দেখিল যে, তিনি ইংরাজী জানেন ও

তাহারা যাহা বলাবলি করিতেছিল সব বুঝিতে পারিয়াছেন তখন ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তিনি তাহাদের কথা বুঝিতে পারিয়াও কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই কেন? তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, "বন্ধুগণ মূর্খলোকের সংসর্গে আসা আমার জীবনে এই প্রথম নয়, আমি ঢের বিয়াকুফ দেখিয়াছি।" সাহেবদ্বয় ইহাতে প্রথমে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল কিন্তু অবশেষে তাঁহার সুগঠিত অবয়ব ও দৃঢ় তেজোব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া নিবৃত্ত হইল ও ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

আর একবার ইহাপেক্ষা আরও একটা কৌতুকাবহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

একজন কৃতবিদ্য থিয়োসফিষ্ট স্বামিজীর সহিত এক কামরায় আসিতেছিলেন। সম্মুখে সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং তিনি স্বামিজীকে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি হিমালয়ে গিয়াছেন কি না ও সেখানে যে সব বড় বড় মহাত্মা আছেন তাঁহাদের দর্শন পাইয়াছেন কি না? স্বামিজী সকল কথায় ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতে সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ সকল মহাত্মারা দেখিতে বিশালকায়, দীর্ঘজটা ও অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন অমর পুরুষ কি না?" স্বামিজী বলিলেন, "হাঁ—নিশ্চয়ই, যিনি যত বড় মহাত্মা তাঁহার দেহ তত বড়, জটা তত দীর্ঘ ও শক্তি সেইরূপ অদ্ভুত।" লোকটী এইরূপ যাহা কিছু বলিতে লাগিল তিনি ক্রমাগত সায় দিয়া যাইতে লাগিলেন ও মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। তারপর তিনি কল্পনাসাহায্যে সেই সকল মহাত্মাদের নানারূপ বিচিত্র শক্তির কথা সেই লোকটীর নিকট

সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। লোকটী হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিল ও শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা তাঁহারা বর্ত্তমান কল্পের (cycle) স্থিতিকাল সম্বন্ধে কি আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "বলিয়াছিলেন বৈকি! এ সম্বন্ধে যে অনেক কথা হয়েছিল। তাঁরা বল্লেন, 'এ কল্প শেষ হয়ে এসেছে, শীঘ্রই সত্যযুগ পড়্বে'। আর মহাত্মারা মানবজাতির উদ্ধারের জন্য এই এই কার্য্য করিবেন।" এই বলিয়া মহাত্মারা যে যে কার্য্য করিবেন তাহার একটা সুদীর্ঘ তালিকা দিলেন। সেই অতিবিশ্বাসী ভদ্রলোকটী স্বামিজীর প্রত্যেক কথা বেদবাক্যের ন্যায় বিবেচনা করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে শুনিয়া যাইতে লাগিলেন এবং এতগুলি নূতন সংবাদ দেওয়ার জন্য তাঁহার উপর অত্যন্ত খুসী হইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ গ্রহণ করিতে বলিলেন। স্বামিজীও তাহাতে অসম্মত হইলেন না। কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার সমস্ত দিন আহার হয় নাই। তাহার উপর বকিয়া বকিয়া ক্ষুধা পাইয়াছিল। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তুলিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও কোনরূপ দ্রব্যসঞ্চয় বা অর্থ গ্রহণ করাইতে পারেন নাই। এ অবস্থায় বিনা বাক্যব্যয়ে ভদ্রলোকটীর প্রদত্ত আহার্য্য দ্রব্যাদি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে তাঁহার কোনই আপত্তি হইল না।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে স্বামিজী লোকটীকে অনেকক্ষণ মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, তাহার অন্তঃকরণটি উন্নত বটে, কিন্তু অলৌকিক ঘটনার প্রতি তাহার আস্থা কিছু বেশী। একটা কিছু অলৌকিক হইলে হয়! সে আর তাহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে তাহার চক্ষুরুন্মীলনে প্রবৃত্ত হইলেন ও শেষে বেশ একটু কড়া করিয়া বলিলেন,

"তোমরা হচ্ছ পণ্ডিত মূর্খের দল! এদিকে লেখাপড়া ও সুশিক্ষার খুব বড়াই কর, অথচ বিনা বিচারে কতকগুলো যাচ্ছেতাই গাঁজাখুরি গল্পও গলাধঃকরণ করিতে ছাড় না।"

লোকটী লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল।

তাহার ভাব দেখিয়া তিনি দয়ার্দ্র হইলেন ও তাহার মস্তিষ্ক হইতে কুসংস্কাররাশি দূর করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের ভাব প্রবিষ্ট করাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া ত বাপু বেশ বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার ত একটু বিবেচনা শক্তি খাটান দরকার! ধর্ম্মের সঙ্গে অলৌকিক ব্যাপারের বা সিদ্ধির যে নিত্য সম্পর্ক আছে এটা কেমন করে তোমার মাথায় সেঁধুল? কিন্তু এটা দেখ্‌ছনা ঐসব সিদ্ধির ব্যবহার যাহারা করে তাহারা কতবড় কামনার দাস! অহঙ্কারের ঢেঁকি! যথার্থ ধর্ম্ম মানে—চরিত্র—সেইটাই হচ্ছে প্রকৃত শক্তি। চরিত্রবান পুরুষেরই রিপুদমন ও বাসনাক্ষয় হয়েছে। আর যারা সিদ্ধি সিদ্ধি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও একটা অলৌকিক শক্তি চাচ্ছে তারা জীবন-সমস্যা সমাধানের পথে একটুও এগোয়নি, খালি দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপব্যবহার কচ্ছে ও স্বার্থপঙ্কে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এই পাগলামী করেই দেশটা উচ্ছন্ন গেছে। তার চাইতে বরং পার যদি জীবনের আসল সত্যের দিকে লক্ষ্য স্থাপন কর, যাহাতে মানুষ হতে পার এমনতর Common sense, public spirit, নিজেদের মধ্যে জাগিয়ে তোল। বৃথা শক্তি ফক্তির লোভে ছুটো না। ওসব আলেয়া। এখন আমরা এমন ধর্ম্ম চাই যাতে আমাদের আত্ম-প্রত্যয় জেগে উঠে, জাতীয় সম্মানবোধ জন্মায়, আর পতিত দরিদ্রদের টেনে তুলবার ক্ষমতা ও বল ফিরে আসে। দেশের শত শত লোক

অনাহারে আছে, লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে সুশিক্ষার অভাবে জন্তু জানোয়ারের সামিল হচ্ছে—এখন তাই দেখ্‌বে, না কোথায় আকাশের কোণ থেকে হিমালয়ের চূড়োর ওপর কোন্ কল্পান্তরের মহাত্মা খসে পড়েছেন তাই দেখ্‌তে ছুটবে! বেশ ক'রে বোঝ বাপু! যদি ভগবান্‌কে চাও, আগে মানুষের সেবা কর। যদি শক্তি চাও, আগে লোকসেবায় দেহক্ষয় কর।"

স্বামিজীর কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটীর চৈতন্য হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কখনও ওসব কাল্পনিক কথায় বিশ্বাস করিবেন না।

গিরিশবাবুকে স্বামিজী এই সময়ের একটা ঘটনা বলিয়াছিলেন, এখানে তাহা বর্ণিত হইল। স্বামিজী বলিয়াছিলেন—

আমি একবার কোন স্থানে যাইবার জন্য এক রেলষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সেস্থানে যাওয়া হইল না। অগত্যা সেই ষ্টেশনেই কয়েক দিন থাকিতে হইল। সেই সময়ে অনেক লোকে দলে দলে আমার নিকট আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। তিন দিন অনবরত লোকসমাগম; আলাপ করিয়া সকলে উঠিয়া যায়, কিন্তু আমার আহার হইয়াছে কি না তাহা কেহ একবার জিজ্ঞাসাও করে না। তৃতীয় রাত্রে সকলে চলিয়া যাওয়ার পর এক দীনব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ, আপনি তিন দিন ত অনবরত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, কিন্তু জলপান পর্য্যন্ত করেন নাই, ইহাতে আমার ব্যথা লাগিয়াছে'। আমি ভাবিলাম বুঝি নারায়ণ স্বয়ং দীনের বেশে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি আমাকে কিছু আহার করিতে দিবে'? সে ব্যক্তি অতি কাতরভাবে বলিল, 'আমার প্রাণ চাহিতেছে কিন্তু কিরূপে

আমার প্রস্তুত করা রুটী দিব! যদি বলেন, আমি আটা ডাল আনি, রুটী ডাল প্রস্তুত করিয়া লউন।' সে সময়ে আমি সন্ন্যাসীর নিয়মানুসারে অগ্নি স্পর্শ করি না। তাহাকে বলিলাম, 'তোমার প্রস্তুত করা রুটী আমাকে দাও, আমি তাহাই আহার করিব।' শুনিয়া সে ব্যক্তি ভয়ে অভিভূত। সে খেতড়ির রাজার প্রজা, রাজা যদি শোনেন যে সে চামার হইয়া সন্ন্যাসীকে তাহার প্রস্তুত রুটী দিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিবেন এবং চাই কি তাহাকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিতেও পারেন। আমি তাহাকে বলিলাম, 'তোমার ভয় নাই, রাজা তোমাকে শাস্তি দিবেন না।' এ কথায় তাহার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল না। কিন্তু তথাপি সে বলবতী দয়া প্রভাবে ভাবী অনিষ্ট উপেক্ষা করিয়া ভোজ্যবস্তু আনিয়া দিল। সে সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণপাত্রে সুধা আনিয়া দিলে সেরূপ তৃপ্তিকর হইত কি না সন্দেহ! তাহার দয়া দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। ভাবিলাম, 'এইরূপ কতশত উচ্চচেতা ব্যক্তি পর্ণকুটিরে বাস করে, কিন্তু আমাদের চক্ষে তাহারা চিরদিন ঘৃণ্য, হীন'।

তাঁহাকে উপরোক্ত মুচির প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে দেখিয়া ষ্টেশনের কয়েকজন ভদ্রশ্রেণীর লোক বলিয়াছিল, "আপনি যে এই নীচ ব্যক্তির স্পৃষ্ট ভোজ্যবস্তু আহার করিলেন এটা কি ভাল হইল?" তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "তোমরা ত এতগুলি লোক আজ তিনদিন ধরিয়া আমায় কত বকাইলে' কিন্তু আমি কিছু খাইলাম কি না তাহার কি খোঁজ লইয়াছ? অথচ নিজেরা ভদ্র আর ও ব্যক্তি নীচ বলিয়া বড়াই করিতেছ! ও যে মনুষ্যত্ব দেখাইয়াছে তাহাতে ও নীচ কিসে?"

খেতড়িরাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার পর স্বামিজী এই

ব্যক্তির দয়ার কথা মহারাজের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। মহারাজ কয়েকদিন পরেই লোকটিকে ডাকাইলেন। সে অতিশয় ভীত হইয়া কম্পিত কলেবরে রাজপুরীতে প্রবেশ করিল। মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল, না জানি অদৃষ্টে কি নির্য্যাতন ভোগ আছে। কিন্তু রাজা তাহাকে যথেষ্ট সাধুবাদ করিলেন ও সেইদিন হইতে তাহার দুঃখ দূর হইল।

আর একবার পদব্রজে বহু পথ পর্য্যটন করিয়া তাঁহার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িল। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল ও তিনি চলৎশক্তি রহিত হইয়া একটী বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। জগৎ প্রখর রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইতেছে, তাঁহার সর্ব্ব শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল ও সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম হইল। সহসা তিমিরাবরণ ভেদ করিয়া বিচ্ছুরিত আলোকরাশির ন্যায় তাঁহার দৌর্ব্বল্য ও অবসাদের মাঝখানে একটা প্রবল চিন্তা জাগিয়া উঠিল। "ইহা কি সত্য নহে যে আত্মার মধ্যে জীবের সমগ্র শক্তি নিহিত আছে? তবে আমি দেহেন্দ্রিয়ের শ্রান্তিতে এত কাতর হইতেছি কেন? এ দৌর্ব্বল্য কোথা হইতে আসিল?" এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সহসা তাঁহার শরীর ও মন বিপুল শক্তিতে ভরিয়া উঠিল। ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সতেজ হইয়া উঠিল। তিনি আবার চলিতে লাগিলেন ও ক্রমে ক্রমে বহু পথ অতিক্রম করিলেন। মনের এই অদম্য তেজ, জড়ের উপর চৈতন্যের এই প্রভাব ইহা বহুবার তাঁহার জীবনে লক্ষিত হইয়াছে। কালিফর্ণিয়ায় তিনি একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

"আমি কতবার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়াছি। কতদিন অনাহারে যাপন করিয়া পথ চলিতে অক্ষম হইয়াছি—গাছের

তলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছি—প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। কথা বলিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু শেষে হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে—"আমার আবার মৃত্যু ভয় কি? আমার জন্মও নাই মরণও নাই। ক্ষুধাও নাই তৃষ্ণাও নাই। সোঽহং সোঽহং। প্রকৃতি আমায় নষ্ট করিতে পারে না, প্রকৃতি ত আমার দাসী। হে মহেশ্বর, তোমার শক্তি প্রকাশ কর, হৃতরাজ্য পুনর্জয় কর, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ইত্যাদি।' অমনি আমার দেহে প্রাণসঞ্চার হইয়াছে, বাহুতে বল আসিয়াছে, হৃদয়ে সাহস দেখা দিয়াছে, মনে তেজ বাড়িয়াছে, আর তাই আজও আমি বাঁচিয়া রহিয়াছি। এইরূপে যখনই আমার জীবনাকাশে চারিদিক হইতে মেঘ ঘিরিয়া আসিয়াছে তখনই সেই মেঘের পশ্চাতে আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইয়াছি; অমনি সকল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক সকলি স্বপন, পর্ব্বতপ্রমাণ বিপদ হউক না কেন ভয় পাইও না—দেখিবে বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। আঘাত কর দেখিবে অন্তর্হিত হইয়াছে। পদাঘাত কর দেখিবে চূর্ণ হইয়াছে।"

আর একবার কচ্ছদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক মরুভূমির মধ্যে গিয়া পড়েন। সূর্য্যদেব মস্তকোপরি অনলবর্ষণ করিতেছেন, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অথচ নিকটে মনুষ্য-বাসের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। তিনি আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও অবশেষে সম্মুখে নির্ম্মল বারিশোভিত একটী গ্রাম দেখিতে পাইলেন। গ্রামের ছোট ছোট কুটীরগুলি দেখা যাইতেছে, আশে পাশে ফলভরে অবনত কত শ্যামল সুন্দর বৃক্ষলতা, তাঁহার মনে এতক্ষণ পরে আশার সঞ্চার হইল। যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। তিনি দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন—আর ২।৪ পা যাইলেই আকণ্ঠ বারি পান করিবেন ও সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায়

বসিয়া মৃদুমন্দ সমীরণ সেবন করিয়া প্রাণ জুড়াইবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই যেন গ্রামখানি সরিয়া যাইতে লাগিল। ঐ যে একটুখানি ব্যবধান কিছুতেই শেষ হইল না। আগেও যতদুর ছিল এখনও যেন ততদুর রহিয়াছে এরূপ বোধ হইতে লাগিল। তখন হঠাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। বুঝিলেন মিথ্যা গ্রাম—মিথ্যা বৃক্ষাবলী শোভিত কুটীর—মিথ্যা বারিপূর্ণ হ্রদ—সবই মরীচিকা! তিনি হতাশ হইয়া বালুকারাশির উপর বসিয়া পড়িলেন ও আকুলনয়নে ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল 'ওঃ কি ভ্রম! জীবনও বুঝি এইরূপ! মায়ার ছলনা এইরূপ! হা সত্য তুমি কোথায়! হা ঈশ্বর তুমি কোথায়! একবার দেখাও তোমরা কোথায়।' অনেকক্ষণ এইরূপ চিন্তানিবিষ্ট থাকিয়া তিনি পুনরায় উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। আবার পূর্ব্ববৎ সেই বৃক্ষ-লতা-হ্রদ শোভিত গ্রামখানি নয়ন সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু আর তিনি ভুলিলেন না। সত্যভ্রমে মরীচিকার পশ্চাতে আর ধাবিত হইলেন না। পাশ্চাত্য দেশে একটী বক্তৃতা করিবার সময় এই ঘটনা স্মরণ করিয়া তিনি মায়াকে মরীচিকার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন।"

আর একবার একজন শিষ্যের সাক্ষাতে অন্যমনস্কভাবে বলিয়াছিলেন—

"ওঃ, কি সব কষ্টের মধ্য দিয়াই দিন গিয়াছে! একবার উপর্য্যুপরি তিন দিন খাইতে না পাইয়া রাস্তার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছে। জলে ভিজিয়া শরীরটা একটু সুস্থবোধ হইতেছিল। তখন উঠিয়া আস্তে আস্তে আবার পথ হাঁটি ও এক আশ্রমে পৌঁছিয়া কিছু মুখে দিই, তবে প্রাণ বাঁচে।"

এইরূপে পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামিজীকে বহুবার বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, বহু কষ্ট অভাব অনটনের মধ্য দিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। অনেক সময় একখানি গীতা ও পরমহংসদেবের একখানি ফটো ব্যতীত আর কিছু সম্বল না লইয়া তিনি পথ চলিয়াছেন। মধ্যভারতে সম্ভবতঃ খাণ্ডোয়া ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে যাইবার সময়ে তাঁহাকে অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে—ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন—যাহারা নিতান্ত অসভ্য ও অতিথি-সৎকার-বিমুখ—এক মুষ্টি ভিক্ষা চাহিলে দেয় নাই, আশ্রয় মাগিলে তাড়াইয়া দিয়াছে। অনেকদিন এমন ঘটিয়াছে যে, কয়েক দিবস নিরম্বু উপবাসের পর কোন-রূপে জীবনধারণোপযোগী দুটী সামান্য কিছু আহার করিয়া শরীরটা রাখিতে হইয়াছে। এই সময়েই তিনি এক মেথর পরিবারের মধ্যে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন এবং এই অবহেলিত নীচজাতীয়দিগের হৃদয়ের মহত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ এই ঘটনা ও এইরূপ অন্যান্য কয়েকটী ঘটনায় তিনি উপেক্ষিত জাতিসমূহের মধ্যে মহত্বের অঙ্কুর লক্ষ্য করিয়া তাহাদের উন্নতিবিধানের জন্য এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। তিনি ধরণীর ধূলিরাশির মধ্যে বহুমূল্য মণিমাণিক্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। দরিদ্রের জীর্ণকন্থার অন্তরালে পরদুঃখে দুঃখী, সমবেদনায়—স্নিগ্ধবারি-সিঞ্চিত কোমল মানব-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার প্রাণ তাহাদের দুঃখের বোঝা দূর করিবার জন্য আকুল হইয়াছিল। তাই তিনি ভারতের কোটী কোটী পতিতসন্তানকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিতে ছুটিয়াছিলেন।

তাঁহার ভ্রমণের পরিসর যতই বাড়িতে লাগিল ও যতই তিনি

নূতন নূতন ক্ষেত্রে নূতন নূতন অবস্থার সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন ততই মাতৃভূমির প্রকৃত অভাব তাঁহার চক্ষে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি ইহার গরিমা উপলব্ধি করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহার দুর্ব্বলতাও দেখিতে পাইলেন। সে দুর্ব্বলতা প্রধানতঃ দেশবাসীর দেশাত্মবোধের অভাব—জাতির জাতীয়ত্বহানি—স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ। তিনি বুঝিলেন, এই দারুণ অনিষ্ট নিবারণের একমাত্র উপায় ঋষিদিগের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা দীক্ষার পুনঃ প্রবর্ত্তন। তিনি বলিয়াছিলেন—"ধর্ম্ম এই দুর্দ্দশার কারণ নহে, ধর্ম্মের অভাবই ইহার কারণ। কর্ম্মজীবনে পরিণত হইলেই ধর্ম্মের শক্তি বৃদ্ধি পায়।"

কিন্তু দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা সর্ব্বদা স্মৃতিপথে উদিত থাকিলেও স্বামিজী অন্তরে চিরদিনই সত্যকাম সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি বিবিধ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলেন ত্যাগই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্ববিধ সামাজিক উন্নতির ভিত্তিভূমি। তাই দেখিতে পাওয়া যায় পাশ্চাত্য-দেশের মঠাধ্যক্ষগণ একসময়ে পাশ্চাত্যজগতের রাজনীতি পরিচালনা ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষা সাধনাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাই ভারতের ইতিহাসেও দেখিতে পাই চিরকাল বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদি ঋষি, শ্রীকৃষ্ণ জনকাদি যোগী এবং বুদ্ধ, শঙ্কর, রামদাস, নানক প্রভৃতি সন্ন্যাসি-গণের এত প্রভাব! সৃষ্টির প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একথা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না যে, ভারতের বর্ত্তমান অবনতি-স্রোত রোধ করিয়া তাহাকে উন্নতির পথে প্রেরণ করিতে হইলে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক-তার অনাবিল প্রবাহে সমুদয় দেশ প্লাবিত করিতে হইবে। সেইজন্য তিনি ত্যাগের আদর্শকে আরও উচ্চ করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং নিজে সন্ন্যাসীর শিরোমণি হইয়াও দেশের ও সমাজের কল্যাণচিন্তায় মুহূর্ত্তমাত্র বিরত হইলেন না। অপরাপর সন্ন্যাসীরাও তাঁহার ভাব

গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন এবং তিনিও প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসী দেখিলেই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের রক্ষক বিবেচনায় চিরদিন তাঁহাদের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। হিমালয়ে ভ্রমণকালে একদিন তিনি এক শীতার্ত্ত বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং দেখিবামাত্রই তাঁহাকে একজন সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ ব'লিয়া বুঝিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীপ্রবর শীতে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া স্বামিজী যাইতে যাইতে নিজের কম্বলখানি দ্বারা তাঁহার গাত্র আচ্ছাদন করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন ও 'নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনেক সময়ে অনেক সন্ন্যাসী তাঁহার সমপ্রাণতায় অভিভূত হইয়া তাঁহার নিকট তাঁহাদিগের পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত এমন কি দোষ বা কলঙ্কের কাহিনীও প্রকাশ করিয়া ফেলিত ও পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য বিষম আত্মগ্লানি অনুভব করিত। হৃষীকেশে এরূপ একটী সাধুর সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তাঁহার প্রশান্তমূর্ত্তি ও পবিত্র আচার ব্যবহার দেখিয়া তিনি বুঝিলেন এ ব্যক্তি প্রকৃতই জ্ঞানপথের পথিক। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ পাইল যে, এই ব্যক্তিই একসময়ে গাজীপুরের পাওহারী বাবার জিনিসপত্র চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছিল, এমন সময়ে পাওহারীবাবা তাহা টের পাওয়াতে সে উহা ফেলিয়া দিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলে পাওহারীবাবা বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অবশেষে তাহাকে ধরিয়া ফেলেন ও জিনিসগুলি তাহার হাতে দিয়া ছাড়েন। স্বামিজী পূর্ব্বেই এই গল্পটী শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে এই সৌম্যমূর্ত্তি সাধুটিকে স্বমুখে সেই পূর্ব্বঘটনা বিবৃত করিতে দেখিয়া

মহাপুরুষ সংসর্গে তাঁহার জীবনের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া পুলকে পূর্ণ হইলেন। সাধু বলিলেন, "তিনি (পাওহারী বাবা) যখন আমায় নারায়ণজ্ঞানে অকুণ্ঠিতচিত্তে সর্ব্বস্ব দান করিলেন, তখন আমি নিজের ভ্রম ও হীনতা বুঝিতে পারিলাম এবং তদবধি ঐহিক অর্থ ত্যাগ করিয়া পরমার্থের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলাম।"

সাধুর বাক্য শ্রবণে স্বামিজী এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, এমন কি তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিবারও অভিলাষ তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল, কারণ প্রকৃতই এই ব্যক্তির অন্তরে তখন সাধুতা বিরাজ করিতেছিল। যে হৃদয় এক সময়ে পরদ্রব্য হরণে লোলুপ ছিল তাহা এক্ষণে সাধুসংসর্গের নির্ম্মল সলিলে প্রক্ষালিত। সেখানে আর কোন কলুষ নাই—কোন মালিন্য নাই। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত স্বামিজীর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইল। স্বামিজী বুঝিলেন লোকটির বস্তুলাভ হইয়াছে। তারপর তিনি কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার কথা প্রায়ই স্মরণ করিতেন এবং আজীবন তাহা স্মরণ রাখিয়াছিলেন। এমন কি পরে আমেরিকায় প্রচার কালে বোধ হয় এই ঘটনা মনে রাখিয়াই তিনি একবার বলিয়াছিলেন, 'পাপীদিগের মধ্যেও সাধুতার বীজ নিহিত আছে।'

আর একবার এক তিব্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজীকে বলিয়াছিল, 'মহারাজ কলিযুগ আ গিয়া'। স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন'! তাহাতে সে উত্তর করিল —'দেখুন পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে কেমন নিঃস্বার্থ ভাব ছিল, একাধিক পুরুষ একজন স্ত্রী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত! কিন্তু এক্ষণে প্রত্যেক পুরুষ একটী করিয়া স্ত্রী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক'। যদিও তাহার অদ্ভুত যুক্তি ও তর্কপ্রণালী দেখিয়া স্বামিজী মনে মনে হাস্য করিলেন তথাপি তাহার

সরল বিশ্বাস ও অকপটতায় তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইল না। সেইদিন হইতে তাঁহার মনে হইল প্রত্যেক জিনিসেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কিছু না কিছু বলিবার আছে। এই ঘটনা ও ভারতের অন্যান্য বহু প্রদেশের বহুধা বিভিন্ন আচার-পদ্ধতি দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তির প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি একটা জিনিসকে বহুভাবে বহুদিক হইতে দেখিতে ও বিচার করিতে শিখিয়াছিলেন।

এই তাঁহার প্রভাস ভ্রমণের কাহিনী। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিতেন ও মধ্যাহ্নে কোন বৃক্ষতলে বা নদীতীরে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সন্ধ্যার সময় ভ্রমণে বহির্গত হইতেন।

মান্দ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামিজী কন্যাকুমারিকা হইতে পণ্ডিচেরী নামক ফরাসী উপনিবেশে উপস্থিত হইলেন।

পণ্ডিচেরীতে তাঁহার সহিত একজন ভয়ানক গোঁড়া ব্রাহ্মণের তর্ক হয়। সে ব্যক্তি তাঁহার উদার ও উন্নত ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার উপর বিষম চটিয়া গেল ও তিনি সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক বিদেশীয়দিগের নিকট হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিয়া বলিল, "আমাদের এ সনাতন ধর্ম্ম সংস্কারের কোন আবশ্যকতা নাই, ম্লেচ্ছেরা উহার কি বুঝিবে? উহাদের সংস্পর্শে শুধু জাতিনাশ হইবে মাত্র।" এইরূপ বলিয়া তুমুল তর্ক জুড়িয়া দিল। স্বামিজীও তাহাকে যত বুঝাইবার চেষ্টা করেন সেও তত তাঁহার প্রতিবাদ করে এবং অবশেষে তিনি যে কথা বলিতে লাগিলেন সেই কথাতেই সে ঘাড় বাঁকাইয়া কেবলই বলিতে লাগিল—'কদাপি ন'—'কদাপি ন'।

পণ্ডিচেরীতে তাঁহার সহিত পুনরায় মন্মথবাবুর সাক্ষাৎ হয়। মন্মথবাবু তাঁহাকে মান্দ্রাজে আপন বাসায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন এবং স্বামিজী তাহাতে সম্মত হইলে উভয়ে একত্রে মান্দ্রাজ পৌঁছিলেন। প্রথম দিনেই মান্দ্রাজে স্বামিজীকে লইয়া একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত সহরে রটিয়া গেল 'এক অদ্ভুত ইংরাজী জানা সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।'

বাস্তবিক মান্দ্রাজেই স্বামিজী সর্ব্বপ্রথম জনসমাজের নিকট বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন এবং মান্দ্রাজবাসী যুবকেরাই সর্ব্ব-

প্রথম তাঁহার উন্নতভাব সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পাশ্চাত্যদেশ গমনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। এ হিসাবে বঙ্গদেশ চিরদিন মান্দ্রাজের নিকট ঋণী থাকিবে।

এখানেও পূর্ব্ববৎ দলে দলে লোক সমাগম হইতে লাগিল ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, মনস্তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচিত হইতে লাগিল। মন্মথ বাবুর বাটীতে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'Swamiji, why is it that inspite of their Vedantic thought the Hindus are idolators?' (স্বামিজী, হিন্দুদের বেদান্তধর্ম্ম থাকাতেও তাহারা মূর্ত্তিপূজক কেন?) তিনি প্রশ্নকর্ত্তার দিকে ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, "Because we have the Himalayas" (কারণ, আমাদের যে হিমালয় রহিয়াছে।) লোকটী প্রথমে উত্তর শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তারপর যখন তিনি বুঝাইলেন, ভারতের চতুর্দ্দিক যে মহান্ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বেষ্টিত তাহাতে কোন লোক তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া অর্চ্চনা না করিয়া থাকিতে পারে না, তখন উত্তরটা তাহার বোধগম্য হইল। সেদিন তিনি বাহ্যপ্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগূঢ় সম্বন্ধ ও সেই সম্বন্ধবশতঃ প্রতি দেশে প্রতি জাতির মানসিক গঠন ও অভিব্যক্তি কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহা অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি যে যেরূপ লোক তাহাকে ঠিক সেই ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। যে ভক্তিপ্রবণ তাহার নিকট ভাব ভক্তি ও অবতারতত্ত্বের উপদেশ দিতেন ও নিজের অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাসে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেন। আবার যে বিচারপরায়ণ তাহার সহিত বিচার ও কূট তত্ত্বমীমাংসার কুশাগ্রীয়বুদ্ধির পরিচয় দিতেন।

মান্দ্রাজবাসীরা তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইল। বেদ বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি যে সাধনবলে বৈজ্ঞানিক সত্যের সহি এক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে—তাহা তাহারা এই প্রথম অনুভ করিল, এবং প্রতিদিন স্বামিজীর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাইতে লাগিল। আজ—কালিদাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, সেক্ষপিয়র ও বায়রণ—কাল—হেলেন ও ট্রয়বাসী, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ—এইভাবে দিন দিন কত প্রসঙ্গই চলিতে লাগিল।

তাঁহার গুণাবলীও তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কলনিনাদী কণ্ঠধ্বনি—সেই কণ্ঠের পীযূষপূর্ণ সঙ্গীত, বিপুল আত্মশক্তি, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি অজেয় তর্কযুক্তি, অদ্ভুত বাগ্মিতা ও শুভ্র-স্বচ্ছ হাস্য-পরিহাস—কোন্‌টির কথা বলিব? তাঁহাকে দেখিবার জন্য মন্মথবাবুর গৃহে দিন দিন জনতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার তেজও যেমন ছিল বিনয়ও সেইরূপ ছিল। পণ্ডিতেরা ঔদ্ধত্যবশতঃ তাঁহাকে অপমান করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ করযোড়ে 'আমি অতি মূর্খ' বলিয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন, আবার কখনও প্রচণ্ড ঝটিকার মত তাঁহাদের সকল যুক্তি-তর্ক ছিন্নভিন্ন করিয়া কোথায় উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার অভিমান ছিল না, বা তিনি বিদ্বেষভাব প্রণোদিত হইয়া কখনও কাহাকে কোন কথা বলিতেন না। তবে প্রয়োজন হইলে স্পষ্ট ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন বা তীব্র প্রতিবাদ করিতেন—মান্দ্রাজে একদিন এক পণ্ডিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'প্রাত্যহিক সন্ধ্যা-বন্দনা ত্যাগ করায় কোন প্রত্যবায় আছে কি না?' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ত্যাগের হেতু কি?' পণ্ডিত বলিলেন, 'সময়াভাব'। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "কি! সময়াভাব? প্রাচীনকালের সেই মহামহা-আর্য্যঋষিগণ যাঁহাদের মত একটা চিন্তা করিতে গেলে তোমার জীবন

ফুরাইয়া যায়—তাঁহারা সন্ধ্যাবন্দনার সময় পাইতেন—আর তুমি সময় পাও না ?" সেইদিনই একজন সাহেবী গোছের হিন্দু বৈদিকঋষিদের উপদেশগুলিকে অর্থহীন বাজে জিনিষ বলিয়া ঈষৎ অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে স্বামীজির চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' বলিয়া একটা কথা আছে। তোমার হইয়াছে তাই। নতুবা, তুমি কি বলিয়া সেই প্রাচীন মনস্বিগণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছ ও তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তোমার ধমনীতে প্রবাহিত সেই সকল পূর্ব্ব-পুরুষের রক্তের অসম্মান করিতেছ। তুমি কি তাঁহাদের উপদেশের কিছু জান ? তুমি কি বেদ কখনও দেখিয়াছ বা তাহার একটী ছত্রও পাঠ করিয়াছ ? তবে বৃথা কেন বাক্যব্যয় কর ? ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও জগতের সম্মুখে হিমালয়ের ন্যায় অটল ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। জগতকে ডাকিয়া বলিতেছে—'এস যদি পার যদি আমাদিগকে উল্টাইয়া দাও।' যদি কারও সাহস থাকে আসুক, দেখুক, পরীক্ষা করুক, সে সত্য উল্টাইবার নয়। তোমার তোমার মত কতগুলো গোঁড়া ও একদেশদর্শী লোকই এ জগতটাকে এত ঘৃণ্য ক'রে তুলেছে।"

দিবারাত্র লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া ক্লান্তি বোধ হইলে স্বামিজী ক্লান্তি দূরীকরণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরাহ্ন কালে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। সেখানে জলমধ্যে আকটিনিমজ্জিত অর্দ্ধাশনে মৃত-প্রায় ধীবরসন্তানগণকে তাহাদিগের গর্ভধারিণীর সহিত জলমধ্য হইতে মৎস্য শিকার করিতে দেখিয়া দুঃখে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত এবং তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন, "হা ভগবান ! এই সকল হতভাগ্যগণকে কেন সৃজন করিয়াছ ? উহাদের কষ্ট যে চোখে

দেখা যায় না! কতদিন প্রভু, কতদিন ধরিয়া উহারা এরূপ কষ্ট ভোগ করিবে!” তাঁহার সমভিব্যাহারী যুবকবৃন্দও তাঁহার হৃদয়বেদনা অনুভব করিয়া মনে মনে ব্যথিত হইত। স্বামিজী কথাপ্রসঙ্গে ভারতের পতিতজাতিদিগের উন্নতি বিধানের জন্য সকলকেই উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে উপদেশ দিতেন। বলিতেন, “যদি অবনত ভারতকে আবার উন্নত দেখিতে চাও তবে এই সকল হতভাগ্যদিগকে বুকে তুলিয়া লও। বেদবেদান্তাদি রত্নরাশি তাহাদিগের মধ্যে অকাতরে বিতরণ কর ও সমাজের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া তাহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দাও।”

তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে গুপ্ততত্ত্ব বা রহস্যবিদ্যা ইত্যাদি সহ্য করিতে পারিতেন না। ধর্ম্মের পথ ত সরল উদাম উন্মুক্ত! ইহার মধ্যে আবার লুকোচুরি কি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। বলিতেন, “গুপ্তবিদ্যা, অলৌকিক রহস্য—এ সকল দিকে ছুটিও না। শক্তি লাভ হবে, সিদ্ধি লাভ হবে, এসব মনে ভাবিও না। এমন কি নিজের মুক্তি পর্য্যন্ত চাহিও না। শুধু পরের মুক্তি খোঁজ, ধর্ম্মের উদ্ধার কিসে হইবে অনুসন্ধান কর, ভারতীয় ভাব কি ক'রে সমুদয় জগতে ছড়িয়ে পড়্তে পারে ভাবিয়া উপায় উদ্ভাবন কর।”

একদিন তাঁহার সম্মানার্থ একটি বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে মান্দ্রাজের প্রায় সমস্ত অগ্রণী ও বিদ্বান ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সেদিন স্বামিজীর প্রতিভাদর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন স্বামিজীকে অপ্রতিভ করিবার উদ্দেশ্যে একটী ক্ষুদ্র দল গড়িলেন ও তাঁহার প্রতি কথা কাটিবার উপক্রম করিলেন। তিনি নিজেকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহারা বলিল, ‘আপনি বলিতেছেন আপনিও ঈশ্বর এক। তবেত আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য এ সব দায়িত্ব কাটিয়া গেল। এখন

আপনি যদি কুকার্য্য করেন তবে আপনাকে ঠেকায় কে?' স্বামিজী বলিলেন, 'যদি আমি ঠিক ঠিক বিশ্বাস করিতাম ঈশ্বর ও আমাতে কোন প্রভেদ নাই—তাহা হইলে আমা দ্বারা কোন কুকার্য্য হওয়া সম্ভবপরই নহে।'

রামনাদের রাজসভায়ও একজন তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল, যে সাধারণ জীবের পক্ষে বাঙ্মনের অগোচর ব্রহ্মকে জানা কি করিয়া সম্ভব? তাহাতে তিনি জোর করিয়া বলিয়াছিলেন—'I have seen the unknown' (আমি সেই বাক্য মনের অগোচরকে জানিয়াছি।)

Triplicane Literary Societyর কয়েকটী অধিবেশনে স্বামিজী উপস্থিত ছিলেন ও তাহার সংস্কারপ্রয়াসী সভ্যগণের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন তাহারা ঠিক উল্টা দিক হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। অর্থাৎ মারো কাটো লোটো এই ভাব। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "সংস্কার খুব ভাল জিনিষ বটে এবং তিনি নিজেও সংস্কারের পক্ষপাতী। কিন্তু তাই বলিয়া নিজের আদর্শটাকে একেবারে উৎপাটিত করিয়া তাহার স্থানে পরের আদর্শ বসাইবার চেষ্টা করিলে কিছু হইবে না। তাহাতে হিতে বিপরীত হইবে। আসল সংস্কারটা হইবে ভিতর থেকে—বাহির থেকে নয়। সব বজায় রেখে—সব ছেঁটে ফেলে নয়।"

একদিন তাঁহার নিকট সিঙ্গারাভেলু মুদালীয়ার নামে খৃষ্টান কলেজের একজন বিজ্ঞানের সহকারী-অধ্যাপক দেখা করিতে আসিলেন। এ ব্যক্তি ঈশ্বর মানিতেন না। তিনি তর্ক করিবার মানসে আসিয়াছিলেন কিন্তু শেষে স্বামিজীর শিষ্য হইয়া গেলেন। স্বামিজী তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন ও কিডি বলিয়া ডাকিতেন। তিনি পরে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন Caeser said 'I came, I saw, I conquered. But

Kidi came, he saw, but—was conquered' ; (অর্থাৎ কিডি জয় করিতে আসিয়া নিজে বিজিত হইয়া গেল) ইহার পরে ইনি স্বামিজীর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন ও তাঁহারই পরামর্শে প্রবুদ্ধভারত পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিলে তাহার অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। শেষজীবনে ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে সাধু সন্ন্যাসীর মত থাকিতেন ও সেই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভী, সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহোদয় বলেন যে, তিনি কতিপয় সহাধ্যায়ীকে লইয়া তামাসা দেখাইবার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটিতে গমন করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গুটীকতক প্রশ্ন দ্বারা স্বামিজীকে পরীক্ষা করিবেন। প্রশ্নগুলির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যাহা যাহা বলিবার ছিল তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই সেগুলি বিশেষভাবে আলোচনা ও আয়ত্ত করিয়া গিয়াছিলেন। মিঃ আয়ার এই সময়ে খৃষ্টিয়ান কলেজের ছাত্র ছিলেন ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বেশ একটু টান হইল। এমন কি এক সময়ে তিনি ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামিজীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন স্বামিজী অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে একটী হুঁকা লইয়া ধূমপান করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গিগণ প্রথমতঃ তাঁহার তেজোদ্দীপ্ত কান্তি দর্শনে স্তব্ধ হইলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অপেক্ষাকৃত সাহস প্রদর্শনপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, ঈশ্বর কিংস্বরূপ ?' (Sir what is God ?) স্বামিজী শুনিয়াও যেন শুনিতে পান নাই এই ভাবে আপনমনে পূর্ব্ববৎ ধূমপান করিতে লাগিলেন। একটু পরে তিনি হুঁকাটী রাখিয়া চক্ষু চাহিলেন ও প্রশ্নকর্ত্তার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'Well my fellow, what is energy ?' 'আচ্ছা বাপু

শক্তি জিনিসটা কি বলিতে পার’? যুবকটী তাঁহার বিজ্ঞানের ঝুলি হইতে দু-চারটা বাঁধাবুলি ঝাড়িলেন কিন্তু স্বামিজী সেগুলি সব খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তারপর সকলে উত্তর দিবার চেষ্টা করিল কিন্তু স্বামিজী আবার তাহাদিগের যুক্তির দোষ প্রদর্শন করিলেন। শেষে তাহারা নিরুপায় হইয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদে ক্ষান্ত হইল। তখন স্বামিজী উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন ‘একি হইল? তোমরা এই ছোট কথাটা (energy) বুঝাইতে পারিলে না? প্রতিদিন এই কথাটী ব্যবহার করিয়া থাক অথচ ইহা কি বলিতে পারিতেছ না —আর আমায় বলিতেছ কি না ঈশ্বর কি তোমাদের তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইবে। তাহার পর তিনি ঈশ্বর ও শক্তি এই দুইটী কথা একসূত্রে গাঁথিয়া এরূপ একটী গভীর চিন্তাপূর্ণ ব্যাখ্যা করিলেন যে যুবকবৃন্দ তাঁহার জ্ঞানের তুলনায় আপনাদিগকে নিতান্ত শিশু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাহারা আরও দুই চারিটী প্রশ্ন করিয়াছিল কিন্তু স্বামিজীর উত্তর শুনিয়া একেবারে দমিয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে যুবকেরা চলিয়া গেল কিন্তু মিঃ আয়ার স্বামিজীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বসিয়া রহিলেন ও স্বামিজী সমুদ্রতীরে সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইলে তাঁহার অনুগমন করিলেন। পূর্ব্ববৎ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল এবং নানা বিষয় হইতে অবশেষে হিন্দুদের দৈহিক অধোগতি ও শারীরিক শক্তির অপচয় সম্বন্ধে কথা উঠিল। স্বামিজী আয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “Well my boy can you wrestle?” (ছোকরা তুমি কুস্তি লড়িতে পার?) আয়ার ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বলিলে তিনি কৌতুকচ্ছলে বলিলেন ‘Come let us have a tustle’ (এসো দেখি একটু লড়ি)। আয়ার তাঁহার মাংসপেশীর দৃঢ়তা ও ব্যায়াম-

কৌশল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া সেই দিন হইতে তাঁহাকে 'পালওয়ান স্বামী' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বামিজীর হৃদয় ধনী দরিদ্র সকলের জন্য কিরূপ উন্মুক্ত থাকিত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যায়।

ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের গৃহে একজন পাচক ছিল, সে স্বামিজীর বিদ্যাবুদ্ধি বা দার্শনিকজ্ঞানের বিশেষ ধার ধারিতে না পারিলেও তাঁহার সাতিশয় অনুরাগী ছিল। এরূপ অনুরাগের কারণও ছিল। একদিন স্বামিজী দেখিলেন, পাচক ঠাকুরটী এক দৃষ্টে তাঁহার মহীশূর রাজপ্রদত্ত হুঁকাটীর দিকে চাহিয়া আছে। তাহার নয়নের সতৃষ্ণভাব দেখিয়া স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি হুঁকাটী চাও?' লোকটী মনে করিল বুঝি তাহার শ্রবণশক্তির ভ্রম হইয়াছে। সেই জন্য চুপ করিয়া রহিল কিন্তু দ্বিতীয়বার ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিল যে তাহার শুনিবার ভুল হয় নাই—সত্যই স্বামিজী হুঁকাটি দিতে চাহিতেছেন, কিন্তু তথাপি স্বামিজীর কথায় তাহার বিশ্বাস হইল না! একি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা! একটা জলজীয়ন্ত মহারাজের দেওয়া হুঁকা—সেটী স্বামিজী তাহাকে দিবেন? না না, স্বামিজী বোধ হয় রহস্য করিতেছেন! কিন্তু যখন সে সত্যই দেখিল স্বামিজী নিজে হুঁকাটি তাহার হাতের মধ্যে দিতেছেন তখন তাহার বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতার সীমা রহিল না। যাহারা তাহার ঘটনাটা শুনিতে পাইল তাহারা বুঝিল এই ক্ষুদ্র ব্যাপারেও স্বামিজী কম ত্যাগ স্বীকার করেন নাই। কারণ হুঁকাটি বাস্তবিক তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল।

পরের প্রীত্যর্থ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ-বিসর্জ্জন স্বামিজীর জীবনে বিরল ছিল না। তাঁহার ব্যবহার্য্য কোন দ্রব্য দেখিয়া যদি কেহ

প্রশংসা করিত তবে সে জিনিসটি তাহারই হইয়া যাইত। আমেরিকায় একবার একজন যুবক তাঁহার ভারত ভ্রমণের নিত্য-সঙ্গী যষ্টিখণ্ডটি দেখিয়া উহা লইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই যষ্টি গাছটীর সহিত বহু তীর্থের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত ছিল। কিন্তু তথাপি তিনি তৎক্ষণাৎ উহা যুবকটীকে দান করিলেন—তাঁহার কথাই ছিল—"What you admire is already yours" (তোমার প্রাণ যাহা চায় সে ত তোমারই)।

মান্দ্রাজে স্বামিজীর বহু ভক্ত জুটিল। আলোয়ারে যাহা হইয়াছিল এখানে তাহাই বৃহদাকারে হইতে লাগিল। তাঁহার কথা শুনিবার জন্য নানাস্থান হইতে নানাবিধ লোক প্রত্যহ মন্মথবাবুর বাটীতে আসিতে লাগিল—বালক, বৃদ্ধ, যুবা, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, মানী, জ্ঞানী, পদস্থ কাহারও অভাব ছিল না।

তাঁহার একজন উচ্চশিক্ষিত মান্দ্রাজী শিষ্য এই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"The vast range of his mental horizon perplexed and enraptured me. From the Rigveda to Raghuvansa, from the metephysical flights of the Vedanta philosophy to modern Kant and Hegel, the whole range of ancient and modern literature and arts and music and morals from the sublimities of ancient Yoga to the intricacies of a modern laboratory—everything seemed clear to his field of vision. It was this which confounded me and made me his slave." অর্থাৎ—

"স্বামিজীর জ্ঞানের প্রসার দেখিয়া আমি স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইলাম।

ঋগ্বেদ হইতে রঘুবংশ, প্রাচীন বেদান্তদর্শনের উচ্চতম দার্শনিক চিন্তা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কান্ত ও হেগেল পর্য্যন্ত—এক কথায় প্রাচীন ও আধুনিক সমুদয় সাহিত্য—এমন কি শিল্পকলা, সঙ্গীতবিদ্যা, নীতিবিদ্যা—প্রাচীন যোগবিদ্যা হইতে আধুনিক বিজ্ঞান পর্য্যন্ত সমুদয়ই তাঁহার নখদর্পণের মত ছিল। তাঁহার এই অগাধ বিদ্যা দেখিয়াই আমি একেবারে স্তম্ভিত হই এবং তাঁহার দাস হইয়া যাই।"

তিন সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত মান্দ্রাজ তাঁহার প্রশংসাধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মিঃ কে, ব্যাসরাও বি, এ, নামে একজন মান্দ্রাজী লিখিয়াছেন :—

"A graduate of the Calcutta University, with a shaven head, a prepossessing appearance, wearing the garb of renunciation, fluent in English and Sanskrit, with uncommon powers of repartee, who sing with full-throated ease as though he was attuning himself to the spirit of the universe, and withal a wonderer on the face of the earth! The man was sound and stalwart, full of sparkling wit, with nothing but a scathing contempt for miracle working agencies preached at the footstool of Mahatmic herarchis........... and lighted the spark of undying faith in a chosen few. (Vol. II. P. 240).

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট—মুণ্ডিত মস্তক, মনোহররূপ, পরিধানে গৈরিক বসন, ইংরাজী ও সংস্কৃত অনর্গল বলিতে অভ্যস্ত, প্রত্যেক প্রশ্নের চোকা চোকা জবাব দিবার অদ্ভুত শক্তি,

সঙ্গীতবিত্তায় এরূপ অভ্যস্ত যে গলা হইতে অতি সহজভাবে পুরা স্থর বাহির হইয়া যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরাত্মার সঙ্গে তাঁহাকে মিলাইয়া দিতেছে, কিন্তু এদিকে একজন নিঃসম্বল পরিব্রাজক মাত্র। বলিষ্ঠ, সাহসী, উজ্জ্বল পরিহাসরসিক পুরুষ, তথাকথিত মহাত্মাগণের পদানুসরণে প্রতিষ্ঠিত অলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠায়ী সম্প্রদায় সমূহের উপর বিজাতীয় ঘৃণাসম্পন্ন.........কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির হৃদয়ে অবিনাশী বিশ্বাসের আগুন জ্বালাইয়াছিলেন।”

ইতঃপূর্ব্বে স্বামিজী তাঁহার পাশ্চাত্যদেশ গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাঁহার মান্দ্রাজী শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ—

“এখন হিন্দুধর্ম্মকে সমুদয় জগদ্বাসীর নিকট প্রচার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ঋষিদিগের এই ধর্ম্মকে আর সঙ্কীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলে চলিবে না, জগৎময় ইহা ছড়াইতে হইবে। সনাতন ধর্ম্মের প্রাচীন দুর্গ জীর্ণ হইয়াছে, শুধু বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ইহাকে কোন রকমে রক্ষা করিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকিলে হইবে না। ইহার পুনঃসংস্কার করিয়া জগতের সমক্ষে ইহাকে বাহির করিতে হইবে ও পূর্ণ উত্তমের সহিত ইহার মহিমা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে হইবে।” তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ভক্তগণ শুধু যে আনন্দিত হইল তাহা নহে, তাহারা অতিশয় উৎসাহের সহিত চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করিল ও অনতিবিলম্বে পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল। কিন্তু সত্যই যখন অর্থ সংগৃহীত হইল তখন স্বামিজী বিষম সমস্তায় পতিত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন “আমি কি নিজের খেয়াল তৃপ্তির জন্য এ সব করিতেছি, না ইহার মধ্যে বিধাতার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে?” তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ও মাঝে মাঝে জগজ্জননীর চরণে প্রার্থনা করিয়া বলিতে

লাগিলেন, "মাগো! তোর কি ইচ্ছা বল্। তুই ত প্রকৃত কর্ত্রী। আমি তোর হাতে কলের পুতুলমাত্র। তোর মনে কি আছে খুলে বল্।" সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সুদূর প্রবাস গমনের পূর্ব্বে তিনি ভাবিতে লাগিলেন—সত্যই কি ইহা জগদম্বার অভিপ্রায় না তাঁহার নিজের অভিলাষ? যদি জগদম্বারই অভিপ্রায় হয় তবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা কেন? অর্থ ত আপনিই আসিবে। এই কথা মনে উদয় হইবামাত্র তিনি শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ! আমি অন্ধকারে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে মার উদ্দেশ্য জানিতে চাহি। যদি আমার গমন তাঁহার অভিপ্রেত হয় তবে তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিন। তাঁর ইচ্ছা হইলে অর্থ আপনি আসিবে। চেষ্টা করিয়া উহা সংগ্রহ করিতে হইবে না। অতএব তোমরা এই সব অর্থ লইয়া দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ কর।" শিষ্যগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল। স্বামিজীরও স্কন্ধ হইতে যেন একটা বিষম বোঝা নামিয়া গেল।

তিনি পুনরায় লোকশিক্ষা দিতে লাগিলেন ও নির্জ্জনে ধ্যানস্থ হইয়া পুনঃপুনঃ জগজ্জননীর চরণে হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। কথনও কথনও তিনি হৃদয়ের ভাব অন্তরে নিরুদ্ধ রাখিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেন। তখন ভাবাবেশে তাঁহার সর্ব্বশরীর ঘন ঘন কম্পিত হইত ও এক অপার্থিব আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সন্ন্যাসী ও তেজস্বী স্বদেশপ্রেমিক তখন মায়ের আহ্বান শুনিবার জন্য যেন ক্ষুদ্র শিশুটীর ন্যায় অবস্থান করিতেন।

এই সময় হায়দ্রাবাদের অধিবাসীরা তাঁহাদিগের মান্দ্রাজী বাবুদিগের নিকট স্বামিজীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে হায়দ্রাবাদে লইয়া

যাইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই আকস্মিক আহ্বানে স্বামিজী জগজ্জননীর গূঢ় উদ্দেশ্য দেখিতে পাইলেন ও হায়দ্রাবাদ গমনে সম্মত হইলেন। বস্তুতঃ তাঁহার যশোরাশি দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। তিনি সাধারণের অপরিচিত সামান্য ভিক্ষুক সন্ন্যাসী হইতে ক্রমশঃ সর্ব্বজনাদৃত স্বামী বিবেকানন্দরূপে সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। মন্মথবাবু হায়দ্রাবাদের রাজ-ইঞ্জিনিয়ার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে টেলিগ্রাম করিলেন যে ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৮৯৩) স্বামিজী হায়দ্রাবাদে পৌঁছিয়া তাঁহার অতিথি হইবেন। তৎপূর্ব্বদিন হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের যাবতীয় হিন্দু মিলিত হইয়া স্বামিজীর অভ্যর্থনার জন্য একটী সাধারণ জনসভা আহ্বানের ব্যবস্থা করিলেন। সুতরাং পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন না যে, স্বামিজী হায়দ্রাবাদ ষ্টেশনে পদার্পণ করিবামাত্র দেখিলেন প্রায় পাঁচশত লোক তাঁহাকে নামাইয়া লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছেন। তাহার মধ্যে হায়দ্রাবাদের মহা সম্ভ্রান্ত আমীর, ওমরাহ, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, রাজপারিষদ্, উকীল, পণ্ডিত, ধনী বণিকাদি বিস্তর লোক ছিলেন। ইহার মধ্যে কয়েকজনের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। যথা,—রাজা শ্রীনিবাস রাও বাহাদুর, মহারাজা রম্ভারাও বাহাদুর, পণ্ডিত রতনলাল, কাপ্তেন রঘুনাথ, সামসুলউল্‌মা সৈয়দআলি বেলগ্রামী, নবাব ইসাদজঙ্গ বাহাদুর, নবাব দুলা খাঁ বাহাদুর, নবাব ইমাদ নওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর, নবাব সেকেন্দর নেওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর, মিঃ এইচ্ ডোরাবজী, মিঃ এফ, এস্, মণ্ডন, রায় হুকুমচাঁদ এম, এ, এল-এল-ডি, চতুর্ভুজ ও মতিলাল শেঠ ব্যাঙ্কাস্, বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তৎপুত্র কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়। কালীচরণবাবু কলিকাতায় থাকিতে স্বামিজীকে জানিতেন এক্ষণে তিনি এই সকল

ব্যক্তিবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্প ও পুষ্পমাল্য স্বামিজীর উপর বর্ষিত হইতে লাগিল।

একজন স্বচক্ষে সেদিনকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন :—"The Swami then a young man of robust health, alighted from a first class compartment in the robes of a Paramhansa, a Kamandulu in hand. He was conveyed to the Bangalow of Babu Madhusudan and was followed thither by many of the gentry. Those who could not go to the station came to have interviews at the Bangalow. Surely we have not witnessed such crowds before to recieve a Swami in Hydrabad ! It was a magnificent reception befitting a reigning Prince."

স্বামিজী—তখন তিনি একজন বেশ বলিষ্ঠ যুবক—পরমহংসের বেশে কমণ্ডলু হস্তে একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে নামিলেন। তাঁহাকে মধুসূদনবাবুর বাঙ্গলায় লইয়া যাওয়া হইল এবং অনেক ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তথায় গেলেন। যাঁহারা ষ্টেশন যাইতে পারেন নাই, তাঁহারা বাঙ্গলাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। একজন স্বামীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এত লোকসমাগম হায়দ্রাবাদে কখনও দেখি নাই। তাঁহাকে বহুসম্মানসূচক রাজোচিত অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

১১ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে সেকেন্দ্রাবাদের একশত হিন্দু অধিবাসী দুগ্ধ, ফলমূল ও মিষ্টান্ন উপহার লইয়া স্বামিজীর সকাশে উপস্থিত হইলেন ও মহবুব কলেজে একটী বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। স্বামিজী সম্মত হইয়া ১৩ই তারিখে বক্তৃতার দিন

নির্দ্ধারিত করিলেন। তারপর কালীচরণবাবু তাঁহাকে গোলকুণ্ডা দুর্গ দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া দেখেন হায়দ্রাবাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাহ হায়দ্রাবাদাধিপতির শ্যালক নবাব বাহাদুর সার খুরশেদ জাঁ আমীরি-ই-কাবির কে, সি, এস, আই মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট হইতে একজন দূত আসিয়া স্বামিজীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন—স্বামিজী আসিবামাত্র তিনি নিবেদন করিলেন—নবাব সাহেব পরদিন প্রাতঃকালে রাজপ্রাসাদে স্বামিজীর দর্শন প্রার্থনা করিয়াছেন। তদনুসারে পরদিবস স্বামিজী কালীচরণবাবুকে সঙ্গে লইয়া নবাবসাহেবের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। নবাবের এডিকং বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। নবাবসাহেবও স্বামিজীকে পরম সমাদরে স্বীয় আসনের পার্শ্বে বসাইলেন ও দুই ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মের মধ্যে সার বস্তু গ্রহণ করিতেন এবং মুসলমান হইলেও হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমুদয় হিন্দু তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিয়া ছিলেন।

নবাবসাহেব স্বামিজীর সহিত হিন্দুমুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিলেন। তিনি নিজে নির্গুণতত্ত্বমাত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া হিন্দুধর্ম্মে যে সগুণ বা পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের ধারণাও দেখিতে পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। স্বামিজী তদুত্তরে ঈশ্বর ধারণার ক্রমবিকাশ প্রণালীর আলোচনা করিয়া দেখাইলেন, সগুণ ঈশ্বরের ধারণা শুধু যে মনুষ্যবুদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহা নহে, কিন্তু মানব ঈশ্বরসম্বন্ধে ইহা হইতে উচ্চতর ধারণায় অসমর্থ। দেহাদিভাব দূর না হইলে নির্গুণ ধারণা মানুষের ঠিক ঠিক হইতেই পারে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ। বলিতে বলিতে তিনি দেখাইলেন যে মনুষ্যজাতির ধর্ম্মবুদ্ধি মনুষ্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত

সত্যানুসন্ধিৎসা হইতে উদ্ভূত। সব ধর্ম্মই এক হিসাবে সত্য, কারণ বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালী বিভিন্ন আদর্শলাভেরই উপায় মাত্র, আর প্রত্যেক আদর্শই সম্পূর্ণভাবে লাভ হইলে মনুষ্যের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ হয়। তিনি আরও বলিলেন, মনুষ্যই সৃষ্টজীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ মনুষ্যের আধ্যাত্মিক বুদ্ধি দ্বারাই বিশ্বের সমস্ত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মনুষ্য স্বয়ং সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া আপনাকে দেবত্বে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বলাভা ধারণ করিল এবং তাঁহার সর্ব্ব অবয়বে একটা বিশেষ শক্তির আবির্ভাব লক্ষিত হইল। তিনি যেন অমরলোকবাসী দেবতার ন্যায় মনুষ্য অনুভূতির প্রতিবস্তু তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন এবং অজ্ঞাতসারে সনাতন ধর্ম্মপ্রচারের জন্য পাশ্চাত্যদেশে গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অসামান্য বাগ্মিতা দর্শনে নবাবসাহেব মুগ্ধ হইয়া হঠাৎ বলিলেন "স্বামিজী আমি আপনার কার্য্যের সহায়তার জন্য এক সহস্র মুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি।" কিন্তু স্বামিজী ধন্যবাদের সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন "নবাব সাহেব, সে সময় এখনও আসে নাই। যখন উপর হইতে আদেশ আসিবে তখন আমি আপনাকে জানাইব।"

নবাবসাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বামিজী মক্কা মসজীদ, মারমিনার, ফলকনামা, বসীরবাগ, নিজামের প্রাসাদাবলী ও অন্যান্য দ্রষ্টব্যস্থান দেখিতে গমন করিলেন। ১৩ই তারিখে প্রাতঃকালে তিনি হায়দ্রাবাদের প্রধান অমাত্য সার আশমান জা—কে, সি, এস, আই, পেস্কার মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর ও মহারাজ শিউরাজ বাহাদুর এই তিনজনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই

তাঁহার আমেরিকা গমন কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অপরাহ্নে মহবুব কলেজে তিনি "My mission to the West" ("আমার পাশ্চাত্যদেশে গমনোদ্দেশ্য") নামক একটি বক্তৃতা দিলেন। পণ্ডিত রতনপাল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক এই বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন ও সভায় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় একসহস্র শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। স্বামিজীকে দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলেন। তিনি এ দিন তাঁহার সর্ব্বোচ্চ ভাবভূমিতে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষায় অধিকার, বিদ্যাবত্তা, ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা ও বাগ্মিতায় সকলেই একবাক্যে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তিনি হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্বের উল্লেখ করিলেন। হিন্দু-জগতের গৌরবের দিনে তাহাদের শিক্ষা ও সাধনা কতটা অগ্রসর হইয়াছিল তাহা দেখাইলেন, এবং বৈদিক যুগ ও তৎপরবর্ত্তী যুগের উন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—এই উদ্দেশ্য মাতৃভূমির লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার ব্যতীত আর কিছুই নহে। সভায় তিনি সুস্পষ্ট বাক্যে প্রকাশ করিলেন যে এই সংকল্প সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারকের বেশে দূরতম পাশ্চাত্যদেশে যাইতে হইবে এবং বেদ বেদান্তের অতুলনীয় মহিমা জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার বাক্যে চমৎকৃত হইলেন।

পরদিবস মতিলাল শেঠ প্রমুখ বেগমবাজারের বিখ্যাত ধনী মহাজনেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পাশ্চাত্যদেশে গমনাগমনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে অঙ্গীকার করিলেন। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটী ও সংস্কৃত ধর্ম্মমণ্ডলসভার কয়েকজন সভ্যও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

আসিলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বামিজী পুনা হইতে একখানি তার পাইলেন, উহাতে পুনার হিন্দু সভাসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে পুনায় যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরে স্বামিজী জানাইলেন "এখন আমি যাইতে অক্ষম, তবে সুযোগ পাইলেই আনন্দের সহিত আপনাদের ওখানে যাইব।" পরদিবস তিনি হিন্দু মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ, বাবা সরফউদ্দীনের বিখ্যাত সমাধিস্থান ও স্যার সালারজঙ্গের প্রাসাদ দেখিতে গমন করিলেন।

হায়দ্রাবাদে স্বামিজীর সহিত এক অদ্ভুত সিদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইনি শূন্য হইতে ইচ্ছামত নানাবিধ ফল, ফুল, বাহির করিয়া দর্শকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারিতেন। স্বামিজীকে তিনি এই সব সিদ্ধাই দেখাইয়াছিলেন। তিনি যখন স্বামিজীর নিকট গমন করেন তখন তাঁহার প্রবল জ্বর। তিনি স্বামিজীকে তাঁহার মাথায় হাত দিতে বলেন। স্বামিজী ঐরূপ করাতে তাঁহার জ্বর ত্যাগ হইল। তখন তিনি স্বামিজীকে পূর্ব্বোক্ত আশ্চর্য্য ক্ষমতা সকল দেখাইলেন। মানুষের মনের শক্তি কতদূর সেই সম্বন্ধে কালিফার্ণিয়ায় একটি বক্তৃতা দিতে দিতে স্বামিজী এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামিজী হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে এক সহস্রেরও অধিক লোক সমাগত হইয়াছিল। কালীবাবু লিখিয়াছেন—

'তাঁহার ধর্ম্মপ্রীতি, সরলতা, অদ্ভুত আত্মসংযম, এবং গভীর ধ্যান-পরায়ণতা হায়দ্রাবাদবাসীদিগের চিত্তে যে স্মৃতির রেখা অঙ্কিত করিয়া-ছিল তাহা ইহজীবনে অপনীত হইবার নহে।'

সঙ্কল্প নিরূপণ ও আমেরিকা যাত্রা

হায়দ্রাবাদ হইতে মান্দ্রাজে ফিরিয়া আসিলে স্বামিজীর মান্দ্রাজী শিষ্যেরা তাঁহাকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং মার্চ্চ ও এপ্রিল এই দুই মাস ধরিয়া তাঁহার আমেরিকা যাত্রার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ চাঁদা তুলিতে লাগিলেন। এই যুবকদলের নেতা হইলেন আলাসিঙ্গা পেরুমল নামে স্বামিজীর একজন নিতান্ত অনুগত শিষ্য। ইনি নিজে মান্দ্রাজের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া চাঁদা আদায় করিতে লাগিলেন ও মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, রামনাদ প্রভৃতি স্থানেও লোক পাঠাইয়া স্বামিজীর ভক্ত, বন্ধু ও শিষ্যগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট অর্থভিক্ষা করা হইত, কারণ স্বামিজী বলিয়াছিলেন 'আমার যাওয়া যদি মার অভিপ্রেত হয় তবে সাধারণ লোকদের নিকটই ভিক্ষা পাওয়া উচিত, কারণ আমি যে আমেরিকা যাইতেছি—সে শুধু ভারতের দরিদ্র বা সাধারণ নরনারীর জন্য।' এ সময়ে আমেরিকা যাত্রার সঙ্কল্প তাঁহার মনে দৃঢ়ভাবে স্থান পাইয়াছিল, কারণ ধর্ম্মমহাসভার ন্যায় একটা বিরাট সভার অধিবেশনে হিন্দুধর্ম্মের মহিমাপ্রচারের যেরূপ সুযোগ উপস্থিত হইবে ঐরূপ সুযোগ সচরাচর উপস্থিত হয় না, এটি তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি শিষ্যদিগের উদ্যমে বাধা দিলেন না কিন্তু তথাপি পরিষ্কারভাবে দৈব আদেশ লাভের জন্য তাঁহার চিত্ত বিষম ব্যগ্র হইয়া উঠিল। একদিন তাঁহার মনে হইল 'আচ্ছা শ্রীশ্রীমা তো ঠাকুরেরই অংশ স্বরূপিণী। তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিলে হয় না? তিনি যেরূপ বলিবেন সেইরূপ করিব।' কিন্তু উক্ত পত্র লিখিবার পূর্ব্বে সহসা এমন

একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে তাঁহার সকল সন্দেহ মিটিয়া গেল, তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন ঠাকুরের আদেশ—তিনি বিদেশাগমন করেন। ঘটনাটি এইরূপ—একদিন রাত্রে তিনি শয়ন করিয়া আছেন—বেশ একটু তন্দ্রাভাব আসিয়াছে, এমন সময়ে দেখিলেন যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমুদ্রতীর হইতে বরাবর জলের উপর দিয়া অপর পারের দিকে যাইতে লাগিলেন ও তাঁহাকে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইতে ইঙ্গিত করিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল ও মনোমধ্যে যেন একটা পরম শান্তির ভাব অনুভূত হইতে লাগিল। কে যেন তখনও তাঁহার কাণে বলিতেছিল—'যাও!' এই স্বপ্নদর্শনের পর হইতে তাঁহার মনে আর দ্বিধা বা ইতস্ততঃ ভাব রহিল না। কিন্তু তথাপি তিনি শ্রীশ্রীমাকে একখানা পত্র লিখিলেন। এ পত্রে আর তাঁহার মতামত চাহিয়া পাঠাইলেন না; শুধু তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া লিখিলেন "মহাবীর যেমন রামনাম স্মরণ করিয়া সমুদ্রের উপর লাফ দিয়াছিলেন, আমিও তেমনি ঠাকুরের নাম লইয়া সমুদ্রের পরপারে চলিলাম।"

বহুদিন পরে স্নেহাস্পদ নরেন্দ্রনাথের সংবাদ পাইয়া শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল তাহা পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে শুধু যে ঠাকুরের প্রধান শিষ্য বলিয়াই স্নেহ করিতেন তাহা নহে, তিনি জানিতেন লীলাসংবরণের পর ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছেন, কারণ ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁহার একদিন এইরূপ অদ্ভুত দর্শন হইয়াছিল—যেন ঠাকুর নরেন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি প্রায়ই নরেন্দ্রের কথা স্মরণ করিতেন ও ভাবিতেন—না জানি বাছা বনে জঙ্গলে অনাহারে অনিদ্রায় কত কষ্টই পাইতেছে। এক্ষণে নরেন্দ্রের পত্র পাইয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। একবার তাঁহার মনে

হইল নরেন্দ্রকে বিদেশ গমন করিতে নিষেধ করেন আবার ক্ষণকাল পরে মনে হইল, না—ভবিষ্যতে হয়ত ইহা হইতে অনেক সুফল ফলিতে পারে, আর ঠাকুর যখন আছেন তখন উহার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন তিনি ঠিক নরেন্দ্রের ন্যায় স্বপ্ন দেখিলেন—ঠাকুর যেন তরঙ্গের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন ও নরেন্দ্রকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিতেছেন। অমনি তাঁহার চিন্তাকুল হৃদয় স্থির হইল, তিনি মনে মনে নিরতিশয় স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন, এমন কি নরেন্দ্রকে জগতের শেষ প্রান্তে যাইতে দিতেও আর তাঁহার ভয় রহিল না। তিনি নরেন্দ্রকে এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইয়া একখানি আশীর্ব্বাদী পত্র প্রেরণ করিলেন, তৎসঙ্গে অনেক উপদেশও দিলেন।

স্বামিজী এই পত্র পাইয়া উল্লাসে কখনও হাসিতে, কখনও কাঁদিতে, কখনও নাচিতে লাগিলেন। আনন্দবেগ প্রশমনার্থ তিনি কিয়ৎক্ষণ নিজ কক্ষে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সমুদ্রতীরে চলিয়া গেলেন ও নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া তাঁহার সঙ্কল্পকে বজ্রবৎ সুদৃঢ় করিলেন। তাঁহার মনে কেবলি উদয় হইতে লাগিল—'আঃ, এতক্ষণে সব ঠিক হ'ল। মারও ইচ্ছা আমি যাই।' ভ্রমণান্তে যখন তিনি মন্মথবাবুর গৃহে প্রত্যাগত হইলেন তখন তাঁহার মুখশ্রীতে দিব্যরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে—যেন একটা নির্ম্মল শান্তির ভাব সেখানে ঢলঢল করিতেছে। শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"Yes, now it is the west—The West! Now I am ready. Let us get to work in right earnest. The mother herself has spoken!"

শিষ্যেরা তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে বাহির হইল এবং অনতিবিলম্বে প্রচুর অর্থ আনিয়া তাঁহার চরণে সমর্পণ করিল। ২।১ দিনের মধ্যেই তাঁহার সমুদ্র যাত্রার সকল বন্দোবস্ত ঠিকঠাক হইয়া গেল—এমন সময়ে খেতড়ি মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সব সঙ্কল্প উল্টাইয়া দিলেন।

স্বামিজী যখন খেতড়িতে ছিলেন তাহার পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে খেতড়ির মহারাজ তাঁহার নিকট পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। স্বামিজীও তাঁহাকে পুত্রলাভ হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যই সে আশীর্ব্বাদ ফলিয়াছে—কিছুকাল পূর্ব্বে খেতড়ি রাজার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মহারাজের আনন্দের আর সীমা নাই। তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডাকিয়া কহিলেন, 'জগমোহন এ উৎসবে স্বামিজীর আসা চাই! তিনি না থাকিলে এ উৎসব আনন্দ সবই বৃথা। তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর।' জগমোহনজী তদনু-সারে এক্ষণে মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলেন ও অনুসন্ধানে স্বামিজী মন্মথ বাবুর বাসায় অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশে যে ভৃত্য ছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'স্বামিজী কোথায়?' সে বলিল তিনি সমুদ্রে গিয়াছেন। জগমোহন নৈরাশ-ব্যঞ্জক স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন 'কি! তিনি কি তা'হলে পশ্চিম দেশে যাত্রা করিয়াছেন? কি বল হে!' কিন্তু সেই সময়ে পশ্চাতের একটি ঘরে তিনি একটা গেরুয়া আলখাল্লা দেখিতে পাইলেন—তিনি স্থির করিলেন "না স্বামিজী কখনই যান নাই।" জগমোহন মান্দ্রাজী ভাষা না জানায় ভৃত্যটীর কথা ভুল বুঝিয়াছিলেন। সে বলিয়াছিল

'স্বামিজী সমুদ্রে গিয়াছেন' অর্থাৎ সমুদ্রতটে ভ্রমণের জন্য গিয়াছেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন স্বামিজী সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন। যাহা হউক ক্ষণকাল মধ্যে একখানি গাড়ী আসিয়া দ্বারদেশে থামিল ও স্বামিজী তাহা হইতে অবতরণ করিলেন। জগমোহন স্বামিজীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তারপর কুশল জিজ্ঞাসাদি হইল। জগমোহন কালবিলম্ব না করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার আগমনোদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন। স্বামিজী সব কথা শুনিয়া বলিলেন 'দেখ জগমোহন, আমি ৩১ মে আমেরিকা যাত্রা করিব—ঠিক হইয়াছে, এখন তাহারই জন্য গোছগাছ করিতে হইতেছে—এ অবস্থায় মহারাজার সহিত দেখা করিবার আর সময় কৈ?' কিন্তু জগমোহন শুনিলেন না বলিলেন—"স্বামিজী, আপনি অন্ততঃ একদিনের জন্যও খেতড়ি চলুন। আপনি যদি না যান মহারাজের মনে নিদারুণ কষ্ট হইবে। আর আপনি যে ওদেশে যাইবার জন্য গোছগাছ বন্দোবস্তের কথা বলিতেছেন ও বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মহারাজ নিজে তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবেন। আপনি শুধু আমার সঙ্গে চলুন।" জগমোহনজীর আগ্রহাতিশয্যদর্শনে স্বামিজী অগত্যা খেতড়ি গমনে সম্মত হইলেন। স্থির হইল তিনি আর এদিকে ফিরিবেন না, বরাবর বোম্বাই হইতেই জাহাজে উঠিবেন। অনন্তর তিনি জগমোহনকে সঙ্গে লইয়া খেতড়ি যাত্রা করিলেন। মান্দ্রাজীরা তাঁহাকে অতি দুঃখিত অন্তরে বিদায় দান করিল।

যখন তাঁহারা খেতড়িতে উপনীত হইলেন তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রাজপ্রাসাদ শতশত উজ্জ্বল দীপাবলীতে আলোকিত ও চতুর্দ্দিকে নানাবিধ উৎসবের চিহ্ন বিদ্যমান। আজ ৩।৪ দিন উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। অনেক নিমন্ত্রিত রাজা ও রাজ-অমাত্য স্বস্থানে প্রস্থান

করিয়াছেন কিন্তু এখনও সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত, নৃত্যগীতবাদ্যে মুখরিত এবং আনন্দস্রোতে ভাসমান।*

স্বামিজী ও জগমোহনলাল শকট হইতে প্রাসাদের সিংহদ্বারে অবতরণ করিবামাত্র রক্ষীরা অস্ত্র-উত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। মহারাজ সে সময়ে পত্রপুষ্প ফল ও মণিমুক্তা-শোভিত সুদৃশ্য রাজতরণীতে বহু রাজ অতিথি কুটুম্ব ও অমাত্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া জলবিহার করিতেছিলেন। গুরুর আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইবামাত্র তিনি সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। অন্যান্য সকলেও দণ্ডায়মান হইয়া অবনত মস্তকে স্বামিজীকে অভিবাদন করিলেন। স্বামিজী স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়া রাজার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। গায়কেরা স্তুতিগান করিতে লাগিল। স্বামিজীর জন্য একটি বিশেষ আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি তাহাতে উপবিষ্ট হইলে মহারাজ অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সনাতনধর্ম্ম প্রচারার্থ তাঁহার শীঘ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে গমনের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন। সভাস্থ সকলেই এতচ্ছ্রবণে তাঁহাকে বহুধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বামিজীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্য শিশুরাজকুমারকে সভামধ্যে আনয়ন করা হইল এবং তিনি তাঁহার মস্তকে হস্তরক্ষা করিয়া কল্যাণবাক্য উচ্চারণ করিলে চতুর্দ্দিকে আনন্দের কলরোল উত্থিত হইল। অনন্তর

---

* খেতড়িতে যাইবার সময় পথে আবুরোড ষ্টেশনে বহুকাল পরে স্বামিজীর সহিত স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সাক্ষাৎ হয়—তাঁহারা তখন পরিব্রাজকভাবে ভ্রমণ করিতেছেন। ইঁহাদের নিকটে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, ‘ধর্ম্ম কর্ম্ম আর কিছু বুঝতে পারি বা না পারি, দরিদ্র, পতিত, অজ্ঞ নরনারীর অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন ক’রে হৃদয়টা খুব বেড়ে যাচ্ছে।’

স্বামিজী মহারাজ ও অভ্যাগত রাজন্যবৃন্দের সহিত কথোপকথনে নিবিষ্ট হইলেন। সেদিন সমগ্র খেতড়ি রাজ্যে রাজগুরুর উপস্থিতি নিবন্ধন যে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

কিয়দ্দিন পরে স্বামিজী বম্বে গিয়া সমুদ্রযাত্রার আয়োজন করিবার জন্য মহারাজের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ অনেকদিন পরে স্বামিজীর দর্শনলাভ করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে পুনরায় এতশীঘ্র গমনোদ্যত দেখিয়া ব্যথিতহৃদয়ে বলিলেন 'স্বামিজী মহারাজ, আপনাকে বিদায় দিতে আমার বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমি বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে চাহি না। তবে আমি জয়পুর পর্য্যন্ত আপনার অনুগমন করিব।' স্বামিজী নিষেধ করিলে মহারাজ পুনরায় বলিলেন 'অতিথিকে বিদায় দিতে হইলে অন্ততঃ রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত ত যাওয়া উচিত।' স্বামিজী আর কি করিবেন। মহারাজ ও জগমোহনলাল রাজকীয় গো-যানে জয়পুর পর্য্যন্ত স্বামিজীর সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। অনন্তর মহারাজ জগমোহনজীকে স্বামিজীর সহিত বোম্বাই পর্য্যন্ত যাইতে আদেশ দিয়া তাঁহার নিকট স্বামিজীর প্রয়োজনীয় ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলেন ও তাঁহার সমুদ্র যাত্রার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তৎসমুদায়ের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া দিলেন। জয়পুর হইতে স্বামিজী ট্রেণে উঠিলেন। তাঁহাকে একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া মহারাজ প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আবুরোড ষ্টেশনে নামিয়া স্বামিজী রাত্রিটা একজন রেলকর্ম্মচারীর বাসায় যাপন করিলেন। এই ভদ্রলোকের গৃহে তিনি পূর্ব্বে দিনকতক ছিলেন ও তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই ষ্টেশনে

পুনরায় গাড়ীতে উঠিবার সময় নিম্নলিখিত অপ্রীতিকর ঘটনাটি সংঘটিত হয়।

স্বামিজীর একজন বাঙ্গালী ভক্ত তাঁহার কামরায় বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। এমন সময় একজন শ্বেতাঙ্গ রেলকর্ম্মচারী আসিয়া সেই ভদ্রলোককে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে আদেশ করিল। ভদ্রলোকটি তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সাহেবের কথা গ্রাহ্য করিলেন না দেখিয়া সাহেব একটু গরম হইয়া রেলের আইনের দোহাই দিয়া পুনরায় তাঁহাকে নামিয়া যাইতে বলিল। ইনিও একজন রেলকর্ম্মচারী সুতরাং রেলের আইন কানুন জানিতে তাঁহার বাকী ছিল না। তিনি বলিলেন এমন কোন আইন নাই যাহার দ্বারা তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু ইহাতে সাহেবটী আরও রাগিয়া গেল এবং ক্রমে দুইজনে বেশ বচসা আরম্ভ হইল। স্বামিজী তাঁহার ভক্তটীকে পুনঃপুনঃ ঝগড়া করিতে নিষেধ করিলেও তিনি ক্রমে গরম হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন এমন সময়ে সাহেব হঠাৎ স্বামিজীকে 'তুম্ কাহে বাত কর্‌তে হো' বলিয়া এক ধমক দিলেন। গৈরিকধারী সামান্য সন্ন্যাসী ভাবিয়াই বোধ হয় সাহেব ধমকাইয়াছিলেন, কারণ রেলে এইরূপ অনেক সন্ন্যাসী যাতায়াত করিয়া থাকেন এবং গুঁতাগাঁতা খাইয়াও নিঃশব্দে চলিয়া যান; কিন্তু শীঘ্রই তাহার ভ্রম ভাঙ্গিল। বুঝিলেন এবার শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছেন। স্বামিজী তাহার অভদ্র আচরণে চক্ষু আরক্ত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন "তুম্ তুম্ কচ্ছ কাকে?" প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গে কথা কচ্ছ অথচ কি করে কথা বলতে হয় জানো না? 'আপ্ ব'লতে পার না?' (What do you mean by তুম্? Can't you behave properly? You are attend-

ing to first and second class passengers and yet do not know manners! Can't you say আপ? Speak like a gentleman.) টিকিট কলেক্টর তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া ও তীব্রভৎর্সনা শ্রবণ করিয়া থতমত খাইয়া গেল বলিল 'অন্যায় হয়েছে, আমি ও ভাষাটা (হিন্দী) ভাল জানি না। আমি শুধু এই লোকটাকে—I am sorry I don't know the language well. I only wanted this man'—স্বামিজীর আর সহ্য হইল না। বজ্রনাদে কহিলেন "তুমি এই বল্লে যে দেশী ভাষা জান না, এখন দেখ্‌ছি তুমি তোমার নিজের ভাষাটাও জান না। 'লোকটা' কি? 'ভদ্রলোকটি' বল্‌তে পার না? তোমার নাম নম্বর বল, আমি তোমার ব্যবহার উপরে জানাব।" (Sir, just now you said you did not know the vernacular, now I see you don't know even your own language. Can't you say this gentleman? Give me your name and number. I shall report your behaviour to the authorities.) একটা মহা গোলমাল বাধিয়া গেল। সাহেব দেখিলেন বেগতিক, চারিদিকে অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে। কাজেই পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্বামিজী তথাপি ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন 'এই শেষ বল্‌চি হয় তোমার নাম নম্বর দাও, নয় ত লোকে দেখুক তোমার মত কাপুরুষ আর দুনিয়ায় নেই' (I give you the last alternative, either give me your name and number or be the worst coward before the public.) এই কথা শুনিয়া সাহেব ঘাড় হেঁট করিয়া সরিয়া পড়িলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল স্বামিজী তখন জগমোহনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'ইউরোপীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে আমাদের কি চাই

দেখ্ছো ? এই Self-respect (আত্মসম্মান জ্ঞান)। আমরা কে কি দরের লোক তা না বুঝে ব্যবহার করাতেই লোকে আমাদের ঘাড়ে চড়্তে যায়। অন্যের নিকট নিজেদের মর্য্যাদা বজায় রাখা দরকার। তা না হলেই তারা আমাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অপমান করে—এতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। শিক্ষা ও সভ্যতায় হিন্দুরা জগতের কোন জাতের চেয়ে হীন নয়, কিন্তু তারা নিজেদের হীন মনে করে বলেই একটা সামান্য বিদেশীও (Third rate foreigner) আমাদের লাথি ঝাঁটা মারে—আর আমরা চুপ করে তা হজম করি।'

স্বামিজী জগমোহনকে সঙ্গে লইয়া বম্বে পৌঁছিলেন ও ষ্টেশনে নামিয়াই আলাসিঙ্গা পেরুমলের দেখা পাইলেন। আলাসিঙ্গা তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য মান্দ্রাজ হইতে এখানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। খেতড়িরাজ জগমোহনকে বারবার বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন "দেখো, যেন স্বামিজীর কোনরূপ অসুবিধা না হয়।" তদনুসারে তিনি বোম্বাই পৌঁছিয়াই স্বামিজীকে সঙ্গে লইয়া সহরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দোকানগুলিতে গিয়া নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিলেন। জগমোহনকে আলখাল্লা ও পাগড়ীর জন্য বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র ও পোষাক পরিচ্ছদাদি কিনিতে দেখিয়া স্বামিজী অনেকবার নিষেধ করিলেন। বলিলেন, একটা যে সে রকমের গেরুয়াবস্ত্র হইলেই চলিবে। কিন্তু জগমোহন তাঁহার নিষেধ শুনিলেন না—স্বামিজীকে রাজোচিত বেশভূষায় ভূষিত করিয়া ও সঙ্গে বহু অর্থাদি দিয়া পি, এণ্ড ও কোম্পানির পেনিনস্থলার নামক ষ্টিমারের একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া আনিলেন। বলিলেন "রাজগুরু—রাজ-গুরুর উপযুক্ত বেশে ভ্রমণ করিবেন।"

অবশেষে ১৮৯৩ সালের ৩১মে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দিন জাহাজ ছাড়িবার কথা। স্বদেশ ও স্বজন ছাড়িয়া বিশাল সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার পূর্ব্বে মনের ভাব কিরূপ হয় তাহা স্বামীজি পূর্ব্বে কখনও অনুভব করেন নাই। এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন। বন্ধুদিগের অনুরোধে তিনি একটি গৈরিক রেশমী পরিচ্ছদ ও গৈরিক পাগড়ী পরিধান করিয়া জাহাজে উঠিলেন। সে বেশে তাঁহাকে একজন দেশীয় রাজা বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার অন্তর তখন বিভিন্ন চিন্তায় দগ্ধ ও বিবিধ ভাবে আন্দোলিত হইতেছিল। সকলেরই ভিতরে কি একটা অব্যক্ত বেদনার ভাব। এ ছাড়াছাড়িতে যেন প্রাণের বাঁধনে টান পড়িতেছে। জগমোহনজী ও আলাসিঙ্গা জাহাজে উঠিবার সিঁড়ির উপরের পথ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গেলেন ও শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। তারপর ঢং ঢং করিয়া জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। সেই সঙ্গে সকলেরই প্রাণের ভিতর যেন আঘাত পড়িতে লাগিল। হৃদয়দ্বার ভেদ করিয়া অশ্রু প্রবাহ ছুটিল। জগমোহন ও আলাসিঙ্গা সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া স্বামিজীর চরণধূলি গ্রহণ করিলেন ও জাহাজ হইতে নামিয়া গেলেন। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

স্বামিজী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা গেল তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, তারপর ব্যাকুলহৃদয়ে ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, বরাহনগরের মঠ ও গুরুভাইদের কথা চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ সমগ্র দেশ, দেশের ধর্ম্ম, সভ্যতা, প্রাচীন মহত্ব বর্ত্তমান দুঃখ ইত্যাদি বহুবিধ চিন্তায় মগ্ন হইলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া উঠিল।

তাঁহার যে বিবেকানন্দ নাম হইয়াছিল তাহা তাঁহার গুরুভাইয়েরা কেহ জানিতেন না কারণ স্বামিজী আমেরিকা যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে

এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি পরিচিত লোকদের হাত এড়াইবার জন্য অনেকবার নিজ নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কখনও নিজকে 'বিবিদিষানন্দ' কখনও 'সচ্চিদানন্দ' কখনও বা অন্য কিছু বলিয়া পরিচয় দিতেন অবশেষে খেতড়ীর রাজার একান্ত অনুরোধে বিবেকানন্দ নামই বজায় রাখিয়াছিলেন।